

তক্কাতকি আর গুলতানি

চিলেচালা আড্ডা হবে এরকমই কথা ছিল, কেন্দ্রে উৎপলকুমার বহু। আড্ডাধারীরা অনেকেই সে শর্ত ভুলে মেরে দিয়েছিলেন, ফলে কিছু গুরুগম্ভীর কথা, প্রশ্নও উঠেছে।

আড্ডাধারীরা: উৎপলকুমার বহু, অজিত চৌধুরী, উপল দত্তগুপ্ত, বিময় ঘোষ, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া হাজির ছিলেন সঞ্জয় চক্রবর্তী, মানস বহু, অসীম রক্ষিত, কলাণ ভট্টাচার্য, শ্রামলী হুর্ ও ভাস্কর রায়। ১৮.৬.৯৪ তারিখে টি জি ২/২৯ তেঘরিয়ায় (কলকাতা-৭০০০৫৯) এই আড্ডা চলে প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক।

রাঘব : উৎপলদা, আপনি যখন কবিতা লেখা শুরুর করেছেন, কলকাতায় আপনারা কাব্য-আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন, সেটা ছিল কমিউনিস্ট মতাদর্শের যুগ। তা সত্ত্বেও এ ধরনের কোনো মতাদর্শের সংগে নিজেকে জড়ানোর চেষ্টা না করে অন্য রাস্তায় গেলেন কেন? অন্যান্য সকলেই যখন তাই করছিল তখন এটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকে। আপনারা অন্য ধরনের কবিতা— অন্য ভাষা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কী কাজ করেছিল এর পিছনে? বিশেষত, আপনার লেখায় বাংলা কবিতার ট্র্যাডিশনের বাইরে যাওয়ার একটা চেষ্টা ছিল— সেটা যে কষ্ট করে করা তাও নয়।

উৎপল : তথাকথিত রাজনৈতিক সচেতনতা আমাদের একেবারেই ছিল না। দুটো বড় ঘটনার সন্তান আমরা, এক— দেশ স্বাধীন হওয়া এবং দুই— দেশ ভাগ হওয়া। দলগত মতাদর্শ বা তাত্ত্বিক পড়াশোনার বিশেষ সুযোগ হয়নি তখন। ১৯৫৯-৬০ সালে, কলকাতা শহর উৎসাহিত হয়ে গেছে। শিয়ালদা স্টেশনে দলে দলে উৎসাহিত ভিড়। যোগেন চৌধুরীর মতো আঁকিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে বসে ছবি আঁকছেন, সন্দীপনের লেখায় শিয়ালদা স্টেশনের উল্লেখ থাকছে, সবই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। ওই ছিন্নমূল বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে একজন মেয়ে প্রসাধন সারছে, পরিচ্ছন্ন হচ্ছে— শারীরিক যাবতীয় প্রক্রিয়া, যৌনতা, জন্ম-মৃত্যু সবই চলেছে ওর মধ্যে। একটা জগত তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে। চোখের সামনে— হাতের কাছে এগুনো ছিল বলে এতেই বেশি উৎসাহিত হয়ে পড়ি আমরা। তথাকথিত তাত্ত্বিক পড়াশোনা, ‘শ্রেণী’কে বোঝার জন্য বই-পড়া— এসব আমাদের তত বেশি ছিল না। বামপন্থী সাহিত্য তখন বেশি পড়া হয়নি। উল্টে-পাল্টে দেখেছি বিখ্যাত সেই বই— *History of Communist Party of Soviet Union. What is Communism* ধরনের বই এসময়ে পড়িনি।

অজিত : এই সময় আর একটা জিনিসও তখনকার লোকেদের মনে আসত ; গ্রাম ভেঙে পড়ছে, শহর গড়ে উঠছে, প্ল্যানিং ইত্যাদি হচ্ছে, ইনজিনিয়াররা চাকরি-টাকার পাচ্ছে। ‘আগেকার মতো আর গ্রাম্য থাকব না, আরবান গদ্য, কবিতা লিখব’ এই ধরনের কোনো মেজাজ কি আপনাদের মধ্যে আসত?

উৎপল : ততটা নয়। আসলে, পরিবার বা যে পরিবেশ থেকেই ব্যক্তি উঠে আসছে সেটাই ছিল প্রত্যক্ষ এবং যে কোনো তত্ত্বকথার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। আমাদের আগের প্রজন্মের বিখ্যাত কবিদের কথা ধরা যাক। তাঁরা সকলেই প্রায় ছিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক— বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমির চক্রবর্তী প্রমুখ। আমাদের সময়ে কিন্তু অদ্ভুত একটা জিনিস দেখা গেল। যেমন, সন্দীপন— কর্পোরেশনে কাজ করে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়— একটা একটা আধা মোড়ক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হবার চেষ্টা করেছে, আমিও খানিকটা

তাই করেছি। সুনীল দায়সারা গোছের টিউশন ইত্যাদি করে চালাত, শরৎ মৃধুজ্ঞে ছিল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এই যে এক-একটা দিক থেকে এক-একটা লোকের নানা পিকিউলারিটিজ নিয়ে আসা— একটা যে আনইভেননেস— একে একটা ছাতার তলায় জায়গা করে দেবার জন্য এক ধরনের সাংগঠনিক প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। যেটা কৃতিবাস-এ ছিল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছিল। এছাড়া পৃথদীশ ছিল, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ছিল— খ্যাতি-অখ্যাতির কথা নয়, নানা ধরনের লোকের সমাগম হয়েছিল— সেটাই বোঝাতে চাইছি।

রাঘব : সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে যে ‘কুলীন-প্রথা’ ছিল— সেটা আপনাদের সময়ে এসে ভেঙে গেল। এখানে প্রশ্ন— অনেকটা সহজাত প্রবণতা থেকেই আমরা অনেক সময়ে অনেক কিছুর করি, সবটা আগে থেকে ভাবা থাকে না। পরবর্তীকালে যেটাকে একটা তাত্ত্বিক চেহারা দেবার ঝোঁক দেখা যায়। যেমন সন্দীপন এখনকার লেখালিখিতে এটাকে থিয়োরাইজ করার চেষ্টা করেন : আমরা একটা রক কালচার তৈরি করার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলি না, অতটা ব্রাহ্ম নই, আমার ভাষা খোলা, ভাষা একটা জ্যাস্ত ব্যাপার সুতরাং রাস্তার কথা— দরকার হলে গালাগালিও সাহিত্যে আসবে, তাহলেই সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হবে। আমার কথা আমি যেভাবে বলতে চাই তার জন্য এই স্বাধীনতা নিতে হবে। এই সচেতনভাবে স্টিরিও-টাইপ ভাঙার ব্যাপারটা কি ছিল ?

উৎপল : সচেতনভাবে ছিল, তবে এটা তো অত তুচ্ছ জিনিসে ভাঙে না, এটা লেখার— কবিতার ফর্ম-এ ভাঙে, তার ইমেজারি, মেটাফর ইত্যাদির ফর্ম-এ ভাঙে যা আবার সবই দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত (interaction) থেকে জাত। আসলে, তাত্ত্বিক ভাবে, ডিসিপ্লিনড ওয়ে-তে পড়াশোনা বলতে যা বোঝায় তা আমাদের মধ্যে কেউই সেভাবে করেনি। শঙ্খ ঘোষ ছিলেন কৃতিবাস-এর একটু আগে। একটা সময়ে ওঁর সম্পর্কে আমি লিখেছিলাম ‘আমাদের ভোরের কেকিকল’। আর শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অলোক সরকার এঁরা কেউই অতটা দলের ছিলেন না। এঁদের অন্যান্য কাগজপত্র ছিল। এছাড়া, আমাদের ক্ষেত্রে আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল। পরিবার বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ মা-বাবা-ভাই-বোন— এদের সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করেছিল। আমরা বন্ধুরা, যাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদিনই দেখা হত, একটা যেন নিজেদের তৈরি করা পরিবারের মতো কাঠামোয় এসে পড়লাম। বাড়ির লোকেদের মূল্যবোধের সঙ্গে বনছিল না বলেই হয়ত, চুপিসারে, যাদের সঙ্গে বনে তাদের মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে উঠছিল।

রাঘব : বিরোধের পয়েন্টগুলো কী ছিল ?

উৎপল : একটু সেনসিটিভ যে কেউ বড় হয়ে উঠে পরিবারের মধ্যে প্রথম যেটা লক্ষ

করে তা হল হিপোক্রিসিস। কোনো ব্যাপারে বাবা-মা মিথ্যে বলেছে— এটা জানানোর মধ্যেই থাকে প্রথম দৃষ্টবোধ। একজন সেনসিটিভ ছেলের কাছে এটা জগত উল্টে ফেলার মতো ব্যাপার। বা, যে দাঁদ বা মাসিকে যতটা নিকলদুষ ভাবতাম তিনি ততটা সচ্চরিত্র নন। এই ইলিউশন-ভাঙাগুলো ভয়ঙ্কর। আবার, খুব ছোটবেলায় যাঁদের দেখেছি, পরে যদি ওঁদের খুব কষ্ট পেতে দেখি, তবে নিজের কষ্টটাও মিশ্রিত হয়ে ওঠে। এটাও ওই ইলিউশন ভাঙার ব্যাপার। ‘গ্রামের স্কুল-মাস্টারমশাই খুব কষ্ট পাচ্ছে’— এটা যে-ভাবে বহু লেখকদেরই লেখার বিষয় হয়ে ওঠে।

অজিত : এইখানেই আপনাদের সঙ্গে আজকের ছেলেদের ফারাক। আপনারা ইনোসেন্ট ছিলেন— ভাগ্যবান ছিলেন, আপনাদের ইনোসেন্স ভেঙেছে। আজ যারা জন্মাচ্ছে, জন্ম থেকে তারা আর ইনোসেন্ট থাকার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে ‘ইনোসেন্স ভেঙে যাচ্ছে’ বলে দৃষ্ট পায়ার যে বিলাসিতা, সেটাও ওদের নেই। আরবানাইজেশন ইত্যাদির জায়গা থেকে আপনাদের ইনোসেন্স ভেঙেছে, সচেতনভাবে সেটা হয়ত বোঝেননি, দেখেছেন চারপাশে নানা হিপোক্রিসিস চলেছে। এখন লোকে বলবে : তাতে কী ?

উৎপল : হ্যাঁ ঠিকই, এটা লোকে বলে, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা খুব ঘরের কাছে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো জেনেরাইজেশন করা ঠিক নয় যে কোন্ প্রজন্ম এটা কীভাবে নেবে। আমার বড়াদিকে, ‘লাইনে দাঁড়িয়েছে’ বলতে যা বোঝায়, যদি সে অবস্থায় দেখি তাহলে আমি কীভাবে আহত হব এটা কোনো তত্ত্বকথা দিয়ে বোঝানো যায় না—

রাঘব : আমাদের যদিও ‘সোনার বাংলা ছিল’— এই গল্প শুনলে বড় হয়েছি তবু জানি ‘সোনার বাংলা’ কোনোদিনই ছিল কম না। সবই গল্পগাথা। হয়ত একটা সময়ে ইরোসন-টা বেশি করে আমাদের চোখে পড়েছে কিন্তু ভাঙন বরাবরই ছিল। উৎপলদা-দের কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে যাবার সময়ে বাবা-র মিথ্যে কথা ধরে ফেলা, সত্য-সংক্রান্ত মূল্যবোধে আঘাত লাগা— ঠিক এভাবে না হলেও আগের প্রজন্মের লোকেরাও তো এই ভাঙনের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু তখন তো এই প্রতিক্রিয়া হয়নি। এটা কেন? কোথাও একটা তফাত নিশ্চয়ই আছে। যে কোনো লেখা বা সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যেই টাইম-স্পেস-এর ছাপ থেকে যায়। আদর্শগত ভাবে বামপন্থী যাঁরা, এ ব্যাপারে তাঁরা বাড়তি ভাবে সচেতন থাকার চেষ্টা করেন ফলে লেখায় আড়ম্বলতা ও মেসেজ-এর একটা বাড়াবাড়ি চলে আসে। যাঁরা সেই গোত্রভুক্ত নন, মনে করেন সাহিত্য জিনিসটা আলাদা, যা মনে হয় সেটাই লিখি, ভাবের প্রকাশ, ইত্যাদি— তাদের ক্ষেত্রেও এই ছাপ থাকে অনেক সূক্ষ্মভাবে, প্রচ্ছন্নভাবে। এটাও তো হতে পারে, যে যতক্ষণ দেশ স্বাধীন ছিল না ততক্ষণ

পর্যন্ত আমার সামনে একটা শত্রু ছিল। হঠাৎ দেখলাম, স্বাধীন হয়েছি, সামনে কোনো শত্রু নেই— এ অবস্থায় দৃষ্টিটা ঘরের দিকে গিয়ে পড়েছে— ‘এই তো আমার লোকজন’। আপনাদের সময়ে এ সুবিধেটা আপনারা পেয়েছেন— নিজেদের স্বজনদের দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগ— যারা স্বাধীনতা পেল তারা কি এটা পাওয়ার যোগ্য— এর প্রতি তারা কী সুবিচার করছে— পেয়ে তারা কী করতে চলেছে—

অজিত : স্বাধীনতার আগে একটা নেগেটিভ আইডেনটিটি ছিল— স্বাধীনতা পাওয়ার পরে সেটাও ভেঙে গেল, তখন আর একটা আইডেনটিটি-র প্রসঙ্গ।

উৎপল : দুটো বা তিনটে ঘটনা আমাদের উপর দিয়ে যায়। প্রথমত, দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে বহুরকম হিপোক্রিসিস ডালা খুলে গেল। দেশ স্বাধীন ঠিক হল না, ভণ্ডামির একটা ট্রাঙ্ক খুলে গেল যেন। দ্বন্দ্ব-স্বর হচ্ছে : দেশভাগ। এটার অভিঘাত (implication) যে কী সাম্প্রতিক, সাইকিক (psyche)-র জগতে কত বড় একটা ঘটনা —এখনও তার জের চলেছে। এটা কোনো যুদ্ধজয়িত দেশভাগ নয়, আয়ারল্যান্ড বা আরবজগত যেভাবে ভাগ হয়েছে তেমন কিছু নয়, এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক একটা ঘটনা। তখনই রাজনৈতিক নেতাদের স্বরূপ খানিকটা উন্মোচিত হল। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা— এমনকি পাঞ্জাবিতে নানাভাবে জিনিসটাকে মেনে নেওয়ার যুক্তি খোঁজা হয়েছে, কিন্তু এগুলোর সেনসিটিভিটি বাংলায় ছিল। চার্লিশ-এর লেখকরা মাকসুমী ব্যাখ্যায় জিনিসটাকে ক্লাস-কলোনিয়ালিজম-ইম্পিরিয়ালিজম-এর দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। এসব তত্ত্বকথা ঠিক আছে। কিন্তু আমরা প্রথমেই ওই তত্ত্বকথাগুলোকে সন্দেহ করতে শুরু করি ; মনে হয়েছিল, এরা বোধহয় প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে না, অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে।

উপল : সন্দেহ করার কারণটা কী ?

উৎপল : একজন লেখকের নাম আমি করছি— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম লেখা ‘ইতিহাস’, তারপরে ‘উপনিবেশ’। ছোটবেলায় ওঁর লেখা বেশ পড়তাম। উনি জলপাইগুড়ির লোক আর আমার ছেলেবেলা কেটেছে দিনহাটায়, সেজন্য একটু পাড়াভূতো দুর্বলতাও ছিল। এঁর লেখাতেই দেশভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো সোস্যালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হতে দেখি। অনেকে বলেন তারাক্ষরের লেখাতেও এই বৈশিষ্ট্য আছে। আমার মতে তারাক্ষরের লেখায় ক্লাস-অ্যানালিসিস ওইভাবে ছিল না। ওঁর লেখায় জমিদারি-প্রথার ভাঙন— নতুন প্রথা তৈরি হচ্ছে— এ জিনিসটা আছে। কিন্তু নারায়ণবাবুর লেখায় ওই প্রবণতা ছিল, যেমন ছিল মানিকবাবুর লেখায়। কিন্তু আমাদের কেমন একটা সন্দেহ হত যে বোধহয় এই জিনিসগুলো ঠিক

নয়, দেয়ার ইজ সামিথিং এলস্‌ । এগুলোকে এত সুপারফিসিয়াল লেভেল-এ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না— ওই যেমন বলছিলাম— দেশভাগের সাইকিক ইমপ্লিকেশনস-এর ভয়ঙ্করতার কথা । সম্পত্তি-হস্তান্তর হলেও একটু সম্পন্ন যারা তারাও বন্ধুতে পারল যে আজ থেকে সব আলাদা হয়ে গেল । আমাদের সময়ে এমন মিথ-ও চালু হয়েছিল যে কলকাতাও ভাগ হয়ে যাবে ।

কতগুলো পরিবর্তনকে ভিসুয়ালি দেখা যায়, আর কতগুলো থাকে অদৃশ্য, সেগুলোকে বোঝা বেশ কঠিন ।

রাঘব : তাহলে বলতে হয় এমন একটা সময়ে আপনারা লেখা শুরু করলেন যখন আপনাদের সামনে কোনো দিশা নেই অথচ প্রশ্ন আছে অনেক । কিছু বামপন্থীদের আপনারা দেখলেন, যাদের সঙ্গে আপনাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও নেই তেমন । আগে স্বদেশিদের যেমন ভাবমূর্তি ছিল, বামপন্থীদের তেমন কোনো ভাবমূর্তিও আপনাদের সামনে নেই । তাদের সম্পর্কে বিধা আছে, প্রশ্ন আছে, কিন্তু সংযোগটা নেই । স্বাধীনতা-পরবর্তী জীবনে যে আর্থিক-সামাজিক সঙ্কট দেখা দিল তাতে কোনো প্রমিসড্‌ ল্যান্ড-ও আপনারা দেখতে পাননি, দেখলেন একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া হিন্টারল্যান্ড-কে । একে ভাষায় ধরার প্রক্ষে আপনাদের কোথায় কী সমস্যা/সঙ্কট হল এবং সাহিত্যের ভাষা বা কবিতার ভাষা বলে যা পূর্বঘোষিত হয়ে আছে তার সঙ্গে মোকাবিলা করলেন কীভাবে ?

উৎপল : অন্যদের কথা বলতে পারবনা, আমি আমার কথাই বলব । আমি দিনহাটায় মানুষ হয়েছি, স্কুল-ফাইনাল পাশ করেছি ওখানেই । জায়গাটা ছিল একটা গঞ্জের মতো । কোনো সাংস্কৃতিক চর্চা সাধারণভাবে ছিল না সেখানে । হয়ত পদ্মজোর সময়ে একটু থিয়েটার হল । এটা বলা প্রয়োজন এ জন্যই যে আজকে, ইন রেট্রোস্পেকট্‌— ওই মেকানিজম— যা-যা ঘটেছিল তার অনেকটা বন্ধুতে পারি । যদিও ‘শ্যামা’, ‘চন্দালিকা’র অভিনয় হতনা, কিন্তু ঈদের সময় মুসলমানদের উৎসব হত । আর সেখানে গান গাইতে আসতেন আব্বাসউদ্দীন । উনি দিনহাটার লোক । আমরা স্টেশনে গুঁকে আনতে যেতাম । আমাদের কৈশোরের কৃষ্ণ— বিরাট ভক্ত ছিলাম গুঁর । খুব বাবু লোক ছিলেন । ১৯৪৪-৪৫ সাল হবে, ওখানে একটা দোকানে গুঁর একটা রেকর্ড গোল্ডেন ডিস্ক অ্যাওয়ার্ড পায় । সারা পৃথিবীতে ওই রেকর্ডটা ওই বিশেষ দোকান থেকে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছিল । বিলেতের এইচ এম ভি-র অফিস থেকে বিরাট একটা শীল্ড আসে । সেটা খোলা হল আমাদের সামনে । বিলিতি জিনিস, তার গন্ধ আলাদা, তার রূপ আলাদা । প্যাকেট খোলা হলে আমরা যে যার মতো একটু খড়, কাপড়, একটু সুতো, দড়ি ইত্যাদি সব নিলাম । বিলিতি জিনিস তো !

আশ্বাসউদ্দীনের সেই রেকর্ডের গানটা ছিল : ‘আল্লা মেঘ দে, পানি দে’। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত বাড়িতে গুঁর গানের খুব একটা চল ছিল না। রেকর্ড কিনতে হলে আমরা শচীন দেবের রেকর্ডই কিনতাম। এঁদের দুজনেরই চরিত্র হচ্ছে— ৪০-৫০-এর একেবারে এক্সট্রিম ক্যারেকটার। ‘আল্লা মেঘ দে’, ‘বাজান, চল যাই চল মাঠে লাঙল বাইতে’ এগুলো ছিল আমাদের ছেলেবেলার মেঠো গান। আশ্বাসউদ্দীন আবার এগুলো শিখেছিলেন রাস্তার এক ভিখারিনীর কাছ থেকে। আর একটু বড় হয়ে, যখন বলা যায় যৌন সচেতনতা তৈরি হল, তখন শুনতে আরম্ভ করলাম— ‘শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে’, ‘আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়’ এই সব গান। এখন শুনলে হয়ত আপনারা হাসবেন— এক কথা, এক সুর। কিন্তু জগন্ময়, নজরুল, শচীন এসবই ছিল আমার কিশোর জীবনের গান, রবীন্দ্রসংগীত এসেছে তার অনেক পরে। গান কিন্তু বাঙালির একটা বিরাত সাংস্কৃতিক উপাদান— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একভাবে বলা যায়, গানই আমাদের গাইড করে। আমার কিন্তু এখনও থিয়োরি হচ্ছে ওই ‘শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে’ এটা বাঙালির র নাভ (raw nerve)-কে দারুণভাবে টাচ করে। এটা আমি বিদেশেও দেখেছি, বাঙালি অনেকেই বলে উঠেছে : ও গান শুনিয়ে না। প্রত্যেক জাতিরই এমন একটা র নাভ থাকে।

রাঘব : তাহলে, আমাদের একটা স্বাভাবিক পরিমণ্ডল ছিল যেখান থেকে আমি পূর্ণাঙ্গ নিতাম তা থেকেই আমার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠত— আমার জীবনচর্যার সঙ্গে যা সম্পর্কিত। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে একটা রবীন্দ্র-সংস্কৃতি চালু হল, তার জনপ্রিয়করণ ঘটল। কিছুটা ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি, তার সঙ্গে ভারতীয় জিনিসের কিছুটা মেলবন্ধন, শিক্ষাদীক্ষা মিলিয়ে দেশজ চেহারা দেবার একটা চেষ্টা, একটা সিনথেসিস— যা রবীন্দ্রনাথে সুন্দরভাবে আছে বলেই আমার ধারণা— সেটা ধীরে ধীরে চাপতে থাকল। আমার যে সোর্সেস (sources)— তার থেকে ক্রমশ দূরে হটতে থাকলাম। আসলে বিচ্ছিন্নতাই ঘটল— এটা একটা দেখবার জায়গা নয় কি ?

উৎপল : এটাও ওই যে মূল্যবোধের ভাঙন (বাবার মিথ্যে বলা ইত্যাদি) সেই ধরনের একটা স্বপ্নভঙ্গের ব্যাপার। রবীন্দ্রসংগীত কিন্তু আমাদের প্রজন্ম থেকে স্বপ্নভঙ্গের মতোই এসেছে। কেননা, আমরা— অন্তত আমি ঠিক রবীন্দ্র-কালচারে বড় হইনি। আমি বড় হয়েছি সেই ধরনের কালচারে যেখানে সম্ভেবেলায় হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গান গাইত কোনো মেয়ে— সে প্রস্তুত হচ্ছে বিয়ের জন্যে, তাকে দেখতে আসবে, তখন এ গান গাইতে হবে। কুচবিহার-জলপাইগুড়ির নিম্ন মধ্যবিত্ত একটা জগত আছে। কাঠের খুঁটির উপরে ঘর, বর্ষায় তিনমাস জলে ভেসে থাকে, খাটের তলায় আলু রাখা থাকে

আর বস্তাভরা চাল, কখনও-সখনও চ্যাং মাছ-টাছ ধরে খাওয়া হয়। বর্ষার সেই অস্তুত জগত সকলকে সেলফ-সার্ফিসিয়েন্ট করে তুলত। বর্ষা যেন দেয়ালের মতো চারপাশ থেকে চেপে ধরত, তিনমাসের এক অবরোধ। তখন কিস্তি বহু কিছু জিনিস চোখে পড়ত। অবরুদ্ধ অবস্থায় একটা লোকের মানসিকতা অন্যরকম হয়ে যায়, হাতের কাছের প্রতিটি জিনিসের ওপর নজর গিয়ে পড়ে—অবরোধের পারসেপশন-টাই এরকম। প্রকৃতির এই অবরোধের প্রসঙ্গ আমার লেখায় আছে : ‘স্মৃতি : শূন্যকনো পাতা ঝরে যায় কবে/সুন্দর (সুধীরলাল) বাংলায়/বিলেতে অনেক আগে...’। এই সূত্রে বালি যে উক্ত কবিতায় শেলী-র দুটো লাইন লুকানো আছে—উড়ন্ত ঝরাপাতার বর্ণনা শেলী-তে এইরকম ‘...hectic red, pestilence—stricken multitudes...’ এবং আমার লেখায় ‘...হেমন্তের ফেলে দেওয়া পাতা ডাল/উড়ে চলে সন্তাসভীত যেন/উন্মাদিনী লাল...’

রাঘব : উৎপলদা, একটা প্রশ্ন আবার চলে আসছে। আপনাদের সময়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, ‘কুলীন প্রথা’ ভেঙে, যাঁরা সাহিত্য করতে এসেছেন, যাঁদের কোনো পের্ডিগ্রি নেই, যে বাপ-দাদা অম্লক-তম্বুক, বা লেখক অধ্যাপনা করেন এবং সাহিত্য করেন, তাঁদের উষ্টোদিকে ছিল রবীন্দ্রনাথ এবং এক ধরনের ব্রাহ্ম সংস্কৃতির একটা জগত যেটা খানিকটা প্রগতিশীল সংস্কৃতির (progressive culture) মধ্যেও ছিল। দুয়ের মধ্যে খানিকটা মেলবন্ধন ঘটেছিল। একটা ধরনের চিন্তা—আমি বলব—খানিকটা একই কথা বিভিন্ন লোক নানাভাবে বলার চেষ্টা করছে—আর একদিকে আপনাদের মতো লেখকরা—যাদের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই অথচ সাহিত্য করতে এসেছেন। এমন একটা অবস্থা যখন রবীন্দ্রনাথের গান গ্রাম অর্বাধ পেঁছে যাচ্ছে, রবীন্দ্র সংস্কৃতি বা পরিশীলিত, মার্জিত সংস্কৃতি পেঁছে যাচ্ছে। এই যে—এক ধরনের সংস্কৃতি হবে, তাতে শিষ্টাচার থাকবে, ভব্য সভ্য হবে তার ভাষা অথচ সব কিছু নিম্নমেনেই গভীর কোনো কথা বলার চেষ্টা করা হবে—মানে এক ধরনের বামুনেনপনা যা আপনাদের সময়তেই আসতে শুরুর করেছে—এই অস্তুত অবস্থায় আপনারা ঠিক কী ফিল করেছিলেন?

উৎপল : সত্যি কথা বলতে কী, অনেক সোস্যালিস্ট চিন্তার প্রয়োগে এই বামুনেনপনা এসেছে। প্যারালাল দুটো যে কালচার—দুটোকেই ঘোর অবিশ্বাস করা ছাড়া, স্যাটায়ায় করা ছাড়া উপায় ছিল না। আমার লেখাতেই আছে : ‘যতদিন কালদুবাবু জীবিত আছেন চিন্তা নেই বুঝে নেব রক্তকরবী’...সংস্কৃতিক কালদুবাবুরা তখন বাজারে এসে গেছেন বেশ ধূতি-টুতি পরে, প্রত্যেকদিনই সন্ধ্যাবেলায় গানের আসর, সভাসমিতি বসছে। একটা ‘বেশ্মা/রাজনৈতিক’ কালচার। আসলে কোনোটাই আমাদের শেষ পর্যন্ত টাচ্ করেনি। মার্ক্সিস্ট বা সোস্যালিস্ট বিশ্লেষণের মধ্যে অ্যানার্কালিটিকাল যে অংশ তা বোঝার জন্য

প্রভূত পড়াশোনা করা দরকার— অ্যানালিটিকাল মাইন্ড থাকা দরকার— সে মাইন্ডটা আমাদের ছিল না। থাকলেও, তেমন গুরুত্ব দিইনি। যার জন্য ভালো লেখাপড়া জানা ছেলেদের নিয়ে হাসাহাসি করছি। আমাদের সময়ে সুনীল দাশ নামে একজন স্কুল ফাইনালে প্রথম হয়েছিল, তাকে তো যাচ্ছেতাই গালাগাল—কোনো কারণ নেই— তার অপরাধ— সে প্রথম হয়েছে, সব বিষয়ে ৯৯-এর উপরে নম্বর পেয়েছে। লেখাপড়ার যে গুরুত্ব, ক্রমশই তার হাস্যকরতা প্রমাণ হতে আরম্ভ করল। দেখা গেল কেউ নাম ভাঁড়িয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে, কেউ জাল সার্টিফিকেট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অমূল্য স্যরের কাছে নিজে না গিয়ে বোনকে পাঠানো ভাল। শোনা যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষবাবুর ছেলে য়েবার পরীক্ষা দেন সেবার যার প্রথম হবার সম্ভাবনা ছিল সে ভ্রপ্ করে যায়, কেননা আশুবাবুর ছেলে প্রথম হবেনই। এগুলো জানার পর বিদ্যাশিক্ষার নিউট্রালিটির উপরে লোকে কী করে বিশ্বাস রাখবে? লেখাপড়াকে সমীহ করা, রাবীন্দ্রিক কালচারকে শ্রদ্ধা করা— এসব আমাদের ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্সিস্ট অ্যানালিটিকাল কালচার-কে শ্রদ্ধা করা— এইসব এক বানের জলে ভেসে গেছিল।

রাঘব : সন্তর-এও লেখাপড়ার আখড়াগুলোকে আমরা বললাম বুদ্ধিজীবীদের সদর দপ্তর এবং এখানে তোতাপাখি তৈরি করা হয়, এমন কিছু লোক তৈরি করা হয় যারা শোষণ হিসাবে কাজ করবে, শোষণের হাত শক্ত করবে— এই চিন্তার সঙ্গে তো আপনাদের একাত্ত বোধ করার কথা—

উৎপল : কিন্তু থিয়োরাইজেশনগুলো করতে আমরা আর ইন্টারেস্টেড ছিলাম না—

রাঘব : না, তখন আপনাদের রিঅ্যাকশন-টা কী হল ?

উৎপল : সন্তর-এ, প্রথমত, আমি এখানে ছিলাম না, বিদেশে শুনোছি। প্রতিটি ভালো ছেলে তৈরি হওয়ার পিছনে যে একটা দুর্নীতি কাজ করেছে— এ বিষয়ে ছাত্র বয়স থেকেই আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার ব্যাপারে গভীর অনীহা ছিল আমাদের। এখন আক্ষেপ হয়, কিছু কিছু ডিসিপ্লিনড পড়াশোনা করা হয়ত উচিত ছিল। কিছু না হোক শরণ সাহিত্যে নারী প্রসঙ্গে তো আজ দু-চারটে মেঠো বস্তুতা দিতে পারতাম।

অর্জিত : আচ্ছা এই সময় কুলীন যেসব কবিরা ছিলেন, যেমন সময় সেন, বিষ্ণু দে—এদের দেখে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করতেন ?

উৎপল : অ্যাপ্রোচ্যাবিলিটি-র দিক থেকে ?

অর্জিত : অ্যাপ্রোচ, ব্যবহার, কবিতার ফর্ম, কবিতাটা ওভাররেটেড কিনা— এইসব ভাবনাচিন্তা যা হয়ত বন্ধুদের মধ্যেই আলোচিত হল, বাইরে বলা নয়—

উৎপল : আমার প্রসঙ্গে একটু বলি। আমি আসলে ছেলেবেলা থেকেই লেখালিখির লাইনের লোক ঠিক নই। আর লেখালিখি যে আমার মূল ক্রিয়েটিভিটি-র

অঙ্গ— তাও নয়। ছেলেবেলা থেকে আমি যাতে ভাল ছিলুম সেটা হচ্ছে হাতের কাজ। পরে বিদেশেও নানারকম কাজ করেছি। আজকাল গৌরবার্থে যাকে ক্রাফট বলে সেই ক্রাফট-এর কাজে আমার উৎসাহ ছিল। ছাপা, ডিজাইন করা, নক্সা করা ইত্যাদি বহু জিনিস শিখেছিলাম। আর একটা জিনিস আমি ভালো চালাতে পারতাম, সেটা হচ্ছে 'ফ্রেট স' (Fret Saw), পায়ে চালানো করাত আর কি! আমরা আদি মণিমেলার সদস্য ছিলাম, সেখানে প্লাই-উড কেটে রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ এঁদের ছবি পেস্ট করতাম। বিক্রি হত। প্রথম বিস্ময়কর একটা জিনিস জীবনে দেখলাম, সেটা হচ্ছে প্লাস্টার অফ প্যারিস। এসব বিস্ময়ের কোনো তুলনা নেই, এর কাছে অ্যানালিটিকাল পড়াশোনা, বই-টাই কিছু আসে না। নামটা শুনে প্রথমে ভাবলাম এটা বোধহয় প্যারিস থেকে আসা কোনো জিনিস। তারপর ভাবলাম, বোধহয় কারবাইড। দেখলাম, তাও নয়, জলে গুলে দিলে পরে শক্ত হয়ে যায়, নানারকম মূর্তি ইত্যাদি গড়া যায়। এটা নিয়ে খুব মাতামাতি শুরু হ'ল তখন। কংগ্রেস মেলায় আমি রাজাগোপালাচারীর মূর্তি বানালাম— অনেকটা ডানা-কাটা পরীর ভঙ্গিতে। উনি খুব রেগে গেলেন। এই জাতীয় জিনিস এবং পারিবারিক সূত্রে শেখা কিছু হাতের কাজে আমার প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। আমার মা নিজে অনেক হাতের কাজ জানতেন— যেমন চামড়ায় পাশ্চিম মেশিন ব্যবহার করে ব্যাগ তৈরি-করা, পুঁতির মালা, স্টোনের দুল বানানো ইত্যাদি। এমনকি বাড়ির জুতো-টুতো পরিষ্কার করার দায়িত্বও আমার উপরে ছিল। ঘরদোর পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখতাম— গৃহকর্মে নিপুণ ছিলাম, বলা যায়—

রাঘব : লোচনদাস কারিগর-এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক?

উৎপল : তা কিছুটা আছে। এর থেকে আমি খানিকটা লেখার ক্রাফট শিখেছি। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা ট্র্যাডিশনাল কবিতা পড়ে আমি লেখার ক্রাফট শিখিনি। এটা শিখেছি দৃশ্য ও বস্তু জগত থেকে, ভিসুয়াল এবং ট্যাকটাইল (tactile) জগত যাকে বলে। এখানে এগদুলোকে ছোটলোকামির কাজ হিসাবে দেখা হয়, কিন্তু আমি বিদেশে গিয়ে দেখলাম ওনারা এসব জিনিসকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এসব কাজ যারা জানে তাদের মাথায় করে রাখা হয়। ইংল্যান্ডে একজন আর্কিটেক্ট-এর কাছে পার্ট-টাইম কাজও করেছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিলাম। ইন্টারভিউ-তে, লন্ডন শহরে তখন যেসব প্রদর্শনী চলছিল তার মধ্যে কোন্টা কোন্টা আমি দেখেছি জানতে চাওয়া হল আর তাদের উপরে মন্তব্য করতে বলা হল। আমি জানালাম যে লন্ডনে কোনো প্রদর্শনী দাঁখনি তবে এডিনবরায় রেনে ম্যাকিনটশ নামে একজনের রেক্টোপেকট— প্রদর্শনী দেখেছি। উনি

ম্যাকিনটশের বিরাট ভক্ত, শূনে মৃদু হয়ে গেলেন। ম্যাকিনটশ এই শতকের শূরুতে জাপানে গিয়ে টোটাল ডিজাইন ধারণাটা শিখে আসেন। লোকে যখন বাড়ি করবে তখন— বাড়ি থেকে শূরু করে জামা-জুতো-চাট-টোবিল-কাটা-চামচ-ছুরি সব কিছু এক ডিজাইনের হবে, দেয়ার শূড বি এ কাইন্ড অফ টোটাল ডিজাইন হারমনি—এটাই উনি জাপান থেকে শিখে আসেন। এডিনবরার প্রদর্শনী দেখে নিমাইকে (চ্যাটার্জী) বললাম : নিমাই, এটা দেখে রথী ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের বাড়ির কথা মনে পড়ে না ? নিমাই বলল : হ্যাঁ। ম্যাকিনটশের একটা বিখ্যাত ডিজাইন হচ্ছে—মেট্রো ডিজাইন—ওই মেট্রো সিনেমা হলের মতো খাঁজকাটা স্থাপত্য। তখনকার দিনে মেয়েদের গহনাতেও ওই ডিজাইনের প্রভাব দেখা যেত। মনে পড়ে, সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের বই আসত আমাদের বাড়িতে, তাই দেখে বিয়ে-অন্নপ্রাশনে, ডাকে, গহনার অর্ডার হত। ওই শিল্পী সম্ভবত ‘ম্যাকিনটশ’ বর্ষাতিরও আবিষ্কারক। বিপ্লবের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২০ নাগাদ ডিজাইনের জগতেও একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। ওখানে নামকরা ছিল ‘ট্যার্টলিন ডিজাইন’। ট্যার্টলিন টাওয়ার হচ্ছে বিখ্যাত, স্বল্প খরচে তৈরি বিশাল চিত্রিত কারু-কার্যময় মোবাইল গুস্ত। এই যে ডিজাইন, নক্সা ভিসুয়ালাইজ করার মানসিকতা—এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে কমলদার (মজুমদার) মিল দেখেছিলাম। উনি শাঁখার কাজ, গালার গহনা, সোলায় নক্সা—এসবে উৎসাহী ছিলেন। আমি লেখা-তে এসেছি এই ক্রাফট-এর ব্যাকগ্রাউন্ড এর থেকেই—সাহিত্যের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নয়।

উপল : আপনি বললেন ক্রাফট আপনার লেখাকে প্রভাবিত করেছিল। ক্রাফট-এ যেমন ফর্ম-এর দিকটাই বড়, বা ধরুন ফর্ম এবং কনটেন্ট এই দুটো দিক থেকেই বলছি—আপনার লেখায় এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কীভাবে স্থাপন করেন ?

উৎপল : আমার লেখায়—আপনি দেখবেন—যে কনটেন্ট-সচেতনতার চেয়ে ফর্ম-সচেতনতাটা বেশি। আমি ফর্মকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। সেটা হয়ত এ কারণেই যে লেখায় আমি কনটেন্ট-এর দিক থেকে আসিনি, এসেছি ফর্ম-এর দিক থেকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা লেখাকে আমি ভিসুয়ালাইজ করতে পারি যে পাতায় কেমন দেখাবে, ছাপায় কেমন দেখাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নিজের পক্ষে লেখা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এখন যেমন ক’দিন ধরে আপনাদের ‘যোগসূত্র’ উল্টে-পাল্টে দেখছি, ‘পাঁচশটি কবিতা’ কীভাবে ছাপা হবে সে নিয়ে কিছু আলোচনাও হয়েছে। আই ট্রাই মাই বেস্ট টু ভিসুয়ালাইজ—সেটা ওই ক্রাফট-এর চিন্তা থেকেই। এখন, অতটা শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় কিনা সেটা আপনাদের বিচার। এর ফলে ক্রাসিসিজম-এর

প্রতি একটা টান স্বতই আসে। ক্লাসিকাল চিন্তাও মূলত ফর্মের প্রাধান্য—
লেখায় যদি অবশ্য ফর্ম এবং কনটেন্ট-কে আলাদা করা যায়। যায় কিনা আমি
না—সন্দেহ আছে—এবং এই ফর্ম-কনটেন্ট-কে আলাদা করার পিছনে
নানা পার্লিটিকস্ও আছে। যাই হোক, যদি ফর্ম-কনটেন্ট কে আলাদা করা
সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে আমার অনেক লেখাতেই কনটেন্ট অত্যন্ত
মান্‌ডেন (mundane)—মানে গদ্যের মতো—না হলেও চলে, গুরুত্ব
নেই কোনো—ও জিনিস হাজার লোকে হাজার বার লিখেছে। এই ফর্ম-
এর সেনসিটিভিটি কীভাবে আসে? ওই যে ‘শাওন রাতে যদি/স্মরণে আসে
মোরে’—এটা গাইলে বাঙালির মনোজগতে (psyche) এর প্রতিক্রিয়ার
কথা যদি ভাবেন তাহলে ইউ আর থিংকিং ইন টার্মস অফ ফর্ম, নট ইন টার্মস
অফ কনটেন্ট। কনটেন্ট-ওয়াইজ এ জিনিসটা অত্যন্ত বাজে—রাবিশ।

রাঘব : ধরা যাক, একটি ‘কালচারড’ পরিবার, তাতে একটি ছেলে জন্মেছে যে ঠিক
সময়ে রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় ইত্যাদি পড়েছে—পড়ে একটা সময়ে সে
সাহিত্য করবে বলে ঠিক করেছে। তাহলে তার একটা সাহিত্যের ডিসিপ্লিন
তৈরি হয়েছে—সে একরকম ভাবে জিনিসটা বুঝেছে। আপনার ইতিহাস
কিন্তু তা নয়।

উৎপল : সম্পূর্ণ উল্টো — হাঃ-হাঃ —

রাঘব : হ্যাঁ, সম্পূর্ণ উল্টো। আপনি কিছু গান শুনেন বা লোকসংস্কৃতির সঙ্গে
আপনার সম্পর্ক হয়েছে। এসব গানে কথাবার্তাগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ
নয়—খুবই ‘পাতি’ কথা, কিন্তু ওই ‘পাতি’ কথাটাই এমনভাবে গাওয়া
হচ্ছে, এমনভাবে পেঁছে দেওয়া হচ্ছে যে সেটা একেবারে মনে গিয়ে বিধ্বছে।
এই সোস-টার—এই ঝোঁকটার সবটাই প্রধান হচ্ছে ফর্ম-এর দিক থেকে।
অর্থাৎ কীভাবে আমি পেঁছব—কীভাবে অনুভূতিটা সৃষ্টি হতে পারে।
চিন্তার চেয়ে অনুভূতিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যা আমি কমিউনিকেট
করতে চাই। পরে আপনার কবিতায় দেখছি যে অনুভূতি চিন্তার আকার
নিচ্ছে, আপনি যতই পরিণত হয়ে উঠছেন—অনুভূতি আর চিন্তার মাঝখানে
যে দেওয়াল, সেটা সরে যাচ্ছে। অনুভূতি থেকে আপনি চিন্তায় পেঁছছেন।
আমাদের এখানকার যে পরিশীলিত সাহিত্য, যেটা ‘কুলীন’ সাহিত্য, সেটা যেন
একটা সাজানো বাগান। আর আপনাদের ক্ষেত্র হল আর একটা বাগান যা
আপনিই হয়েছে, যেমন একটা প্রাকৃতিক অরণ্য। আর এখন চলছে সোশ্যাল
ফরোষ্ট্র—যার গাছগুলো জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যদি বলা হয়
শিল্প-সাহিত্যের উপযোগিতা কী—তাহলে বলব এটা প্রয়োজনের সীমার
বাইরে যে প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রের ব্যাপার। তাই যদি হয় তবে এর কোনো
কনক্রিট শেপ থাকতে পারে না। এতে আমাদের অনেকাংক অনুভূতির

রঙ মিশে থাকে। একজন লোক যেমন মাতাল অবস্থায় এমন কিছু কথা বলে যা সে স্বাভাবিক অবস্থায় বলে না। সাহিত্যে যেমন ইনটারেক্টিভ ইমাজিনেশন। এই যে প্রমত্ততা, এটা আর আমাদের সাহিত্যে নেই। আপনার কবিতায় দেখেছি এই প্রমত্তাকে বাগে আনার একটা চেষ্টা, সেটা বোধহয় আপনার ওই ক্রাফট-এর জোর।

উৎপল : একটা কথা বলার আছে। ইফ ইউ গো অ্যালং পারসুইং দ্যাট লাইন অফ আরগুমেন্ট, ইউ উইল এন্ড আপ ইন রোমান্টিক পোয়েটস। রোমান্টিক কবিরা হয়ত এটা আরগু (argue) করবে। সোজা কথা হচ্ছে — ইয়োর ফাস্ট ফিলিং অ্যাভাউট এনিথিং ইজ ইয়োর গাট ফিলিং। কোনো সন্দেহ নেই এতে। বিপ্লব হোক, ক্ষুধা হোক সব ক্ষেত্রেই ফাস্ট ফিলিং ইজ গাট ফিলিং, ফাস্ট ফিলিং হচ্ছে ইনটুইটিভ ফিলিং, ইমোশনাল ফিলিং। পরে, হয়ত মানুষ র্যাশনালাইজ করার চেষ্টা করে।

রাঘব : কিন্তু র্যাশনালিটি-কে আজ অত শ্রদ্ধার চোখে দেখি না। মনে করি যে র্যাশনালিটি অনেক সময় অনেক কিছুকে ধ্বংস করে রাজত্ব করেছে এবং ইর্যাশনাল জোন যেটা, সেটা র্যাশনালিটি-র থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত শিল্প সাহিত্যে।

[সামান্য ছেদ, ধ্রুপদ মদ ঢালা, হাতে হাতে তুলে দেওয়া ইত্যাদি।]

উৎপল : ‘র নাভ’ বলতে আমি যা বোঝাতে চেয়েছি সেটা বিরাট একটা অ্যাসোসিয়েশনাল ব্যাপার। প্রথমত বাঙালি সাহিত্য-র একটা অঙ্গ হচ্ছে বর্ষার গান, আর একটা, যেমন মধ্যযুগের কবিতা। আমাদের ভিতরে পদাবলী, রাধার অভিসার, যমুনা নদী— এই ডার্ক ফোর্সেস (dark forces)-গুলো কাজ করে। যারা ক্রিয়েটিভ জাতি হয় তাদের মধ্যে এগুলো সহজে বিকাশ পায়— তাদের ক্রিয়েটিভিটির মধ্য দিয়ে। অন্যদের হয়ত সাইন্স-এ পায়, আমি ঠিক জানি না। এ প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট কাহিনী বলি। বিদেশে যখন ছিলাম, প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত, নিঃসঙ্গ বোধ করতাম। সন্ধ্যাবেলা একটা বার-এ গিয়ে বসতাম ; ওখানে একটা দল আসত, তাতে খানিকটা প্রাণসঞ্চার হত। একদিন হয়েছে কী— গিয়ে দেখি, কেউ আসেনি, আমি একা। আমাদের মধ্যে বলাই ছিল, একা থাকলে অন্য কোনো দলে দলে গিয়ে যেন না পড়ি, কেন না নানারকম ঝামেলা, ড্রাগ ইত্যাদি চলত সেখানে। মাঝে-মাঝে পুর্নালিশ রেইড করত। সে দিন একা বসে আছি, একটা ছেলে বিয়ারের বোতল নিয়ে আমার টেবিলে বসল ; বলল : তুমি ইন্ডিয়ান ? আমি বললাম : হ্যাঁ, তুমি ? বলল : আমি আইরিশ। পেইন্টার। ঘরবাড়ি রং করে। অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি।

এইভাবে গল্প শুরুর হল। দেখলাম, গান্ধী-টান্ধী দু-চারটে জিনিস ছাড়া ইন্ডিয়া সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। আমাকে বলল : তুমি কী কর ? বললাম : লিখি। ও বলল : তোমাদের দেশে কোনোদিন বিপ্লব হয়েছে ? আমি বললাম : না, সেরকম কিছু হয়নি। বলল : তাহলে লেখ কী করে ? আমি দেখলাম, বেশ জটিল প্রশ্ন করেছে, তখন 'বার' বন্ধ হবার সময়। বললাম : আমি মনে করি লেখার সোর্স নানা জায়গায় হতে পারে, এমনকি প্রেজ্জুডিস্ থেকেও লেখা হতে পারে। ও দেখল যে যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন নয়, এ হচ্ছে অনেক গভীর জলের মাছ। বগলে একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে আমাকে বলল : চল—আমার বাড়িতে। মনে পড়ে গেল, আমার স্যাণ্ডাভরা কারো বাড়িতে যেতে বারণ করেছিল। তবু লোকটাকে দেখে অনুমান হল হার্মলেস আর আমারই মতো হাইট এবং চেহারা—খুব বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। খানিক দূরে গিয়ে ওর বাড়ি। দোতলায় উঠে দরজা খুলল—দেখলাম দুটো ঘর, তাতে চার-পাঁচটা খাট আর প্রতিটা খাটে অন্তত একটা করে বাচ্চা। বাচ্চাগুলো তো সব 'ড্যাডি এসেছে' বলে লাফিয়ে উঠল আর বউ ওকে দেখেই 'ইউ বাসটার্ড', এত রাতে ফিরেছ, আবার নিশ্চয়ই কোনো মাতাল বন্ধু নিয়ে এসেছে'—এইসব বলতে আরম্ভ করল। ও বিশেষ আমল না দিয়ে একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে আমাকে নিয়ে বসল। যেখানেই হাত দেয় দোঁখি একটা মদের বোতল বোঁরয়ে পড়ে। পাক্সা আইরিশ চরিত্র। তর্ক তখনও চলেছে। আমি বললাম : তুমি উদাহরণ দেখাও যে সার্থক কোনো কিছু রেভোলিউশন-এর সময় হয়েছে, প্রি-রেভোলিউশনারি পিরিয়ড-এ হয়। বিপ্লব যখন হব-হব—তখন হয়—রাশিয়াতে যেমন হয়েছে। দেখলাম, মানতে রাজি নয়। রাগি প্রায় একটা। তর্ক জমে উঠেছে। দুজনেরই বেশ নেশা হয়েছে। আমাকে বলল : একটা গান শুনবে ? ছোট্ট একটা রেকর্ড প্লেয়ার বার করে জোর ভল্যুমে চালিয়ে দিল। ঘুমন্ত বাচ্চারা সব জেগে উঠল। আবার বউয়ের গালাগালি। মিনিট তিনেকের ছোট্ট একটা গান—একটা বাচ্চা মেয়েকে বলা হচ্ছে : তুমি ঘুমোও, চিন্তার কিছু নেই, কেননা তোমার মাথার কাছে 'কারমেলিটা' আছে। গান শোনার পর ওকে বললাম : বিশেষ কিছু তো পেলাম না, এটা তো ঘুমপাড়ানি (lullaby type-এর) একটা গান। ও বলল : তুমি বুঝতে পারনি, 'কারমেলিটা' হচ্ছে মেশিনগান; বলা হচ্ছে এই মেশিনগান তোমাকে রক্ষা করবে আর তুমি শান্তিতে ঘুমোবে কারমেলিট এক খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী। আইরিশ লিবারেশন আর্মি-র বিবিধ বন্দুক-পিস্তলের এ প্রকার ধর্মীয় নাম দেওয়া হয়েছে। বুঝলাম এ বড় কঠিন ঠাই, এ জিনিস আমাদের মধ্যে নেই। যে কথা দিয়ে শুরুর করেছিলাম—এক এক জাত এই ডার্ক ফোর্সেস পারসিভ করে। আর আইরিশদের

এগুলো থেকে— বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যাপার, পাদরী, নান্, ইত্যাদি থেকে বেরদুবার কোনো উপায় নেই। ইট ইজ এ পার্ট অফ দেয়ার সাইকিক ওয়াল্ড।

রাঘব : ডার্ক ফোর্সেস বলতে কী বোঝাতে চাইছেন ?

উৎপল : ডার্ক ফোর্সেস বলছি কারণ এটা সাবটেরানিয়ান, আন্ডারগ্রাউন্ড, এ-জিনিস চট্ করে কেউ প্রকাশ করবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, বাঙালি মনো-জগতের অঙ্গ যেমন যমুনা নদী ; সেটা যে বিশাল যমুনা নদী, তা নয়। এটা গাঁয়ের, রাধাকৃষ্ণ—

রাঘব : সৌক এখনও আছে ?

উৎপল : ‘যমুনা’ সাইকি এখনও আমাদের আছে।

রাঘব : এখনকার ছেলেপুলেদের মধ্যে ?

উৎপল : এখনকার ছেলেপুলে বলতে যারা শহুরে তারা হয়ত হারিয়ে ফেলেছে এটা।

রাঘব : গ্রামও তো বিকৃত অর্থে শহর হয়েছে।

উৎপল : তাহলেও আমার মনে হয় না এইসব ফোর্সেসগুলো অত সহজে যায়। এগুলো এক-একটা সিম্বল, যমুনা নদী একটা জাতি প্রতীক। ধরুন, সাপের গল্প। বাঙালির আড্ডায় সাপের গল্প আসবেই। প্রত্যেক বাঙালির একটা করে নিজস্ব সাপের গল্প আছে। সাপ হচ্ছে আমাদের মনোজগতের, আমাদের সাইকিক ওয়াল্ড-এর ওই ডার্ক ফোর্স-এর একটা অঙ্গ। সাপ, যমুনা-নদী, বর্ষাকাল—

রাঘব : এই ডার্ক ফোর্স-টা আর একটু ব্যাখ্যা করুন।

উৎপল : ডার্ক শব্দটা মর্যাল বা গুড-ইভল প্রসঙ্গে ব্যবহার করছি না। যেটা বলতে চাইছি সেটা হল—এটা আমাদের গভীরে সাব-কনসাস মাইন্ড-এর ভিতরে রয়েছে, নানারকম কীউ (cue)-এ, বা যোগাযোগের ফলে সেটা বেরিয়ে পড়ে, নানা অন্য অ্যাকটিভিটিতেও বেরিয়ে পড়ে। সেদিন কমল (চক্রবর্তী) আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে গদ্যের বইয়ের কভারটা কীরকম হবে? আমি বলেছিলাম : বাড়িতে যে জেঠিমা সারাবছর রান্না করে আসছে সে অণ্টমীর দিন ঠাকুর দেখতে ঠিক যেটুকু সেজে-গুজে বের হয়, বইটাও ততখানি সাজানো-গোছানো হবে। বলা মাত্রই ও বন্ধু ফেলল। তার মানে, কমল একটা জগত আমরা শেয়ার করছি। একটা মিথের সহোদর আমরা।

রাঘব : তাহলে বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে একটা ‘বাঙালি’ আছে আর একটা ‘ইয়োরোপ’ আছে।

উৎপল : আমাদের ইয়োরোপ নেই।

রাঘব : আপনার বইটা যেভাবে প্রকাশ করতে চাইলেন সেটা ‘বাঙালি’ একটা প্রোডাকশন। আর একটা ইয়োরোপীয় প্রোডাকশন আছে—স্মার্টলি প্রোডিউস করাই তার লক্ষ্য। বাঙালি প্রোডা মহিলার অণ্টমীর দিনের ঠাকুর দেখার

আটপোরে সাজ —এভাবে সে প্রচ্ছদের কথা ভাবে না। আজকের দিনে আপনার কি খুব খারাপ লাগবে উৎপলদা, যদি আপনার কোনো কবিতার বই প্রচুর কপি বিক্রি হয়— ধরুন, তসলিমা নাসরিনের মতো—

উৎপল : আমি খুব অপমানিত হব। এটা সম্ভব নয়। এরকম কল্পনা করাও সম্ভব নয়। যেন ‘কাল দশলাখ টাকা পেলে কী করবেন’—এরকম একটা প্রশ্ন। কেন আমাকে এভাবে উত্কণ্ট করা ?

রাঘব : আপনি উত্কণ্ট হতেও চান না ?

উৎপল : না-না, যা আমার কথা নয় তা জোর করে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া—বিষাক্ত সব জিনিস—হাঃ-হাঃ, তারপরে রি-অ্যাকশন দেখা কুকুরটা কতক্ষণ বাঁচে, বা এর লোম পড়ে যায় কিনা—হাঃ-হাঃ—

রাঘব : কিন্তু আপনার সহযোগীরা অনেকেই অসম্ভব রকমের বাজার-সচেতন। আপনি এখনও পর্যন্ত আপনার কবিতা সম্পর্কে গদ্যটিক্সের লোক কী ভাবে এটা নিয়েই কনসার্নড, লক্ষ লক্ষ লোক কী ভাবে সে বিষয়ে উদাসীন। এটা কেন ? সাহিত্যের বাজার বদ্বলেন না কেন ? আপনি কি উদার—মহান চরিত্রের কোনো লোক ? কোটি টাকার বই বিক্রি হলে আপনিও অনেক টাকা পাবেন—কোনো লোভ নেই আপনার ?

উৎপল : শুনছি, কোটি কোটি বই যাদের বিক্রি হয় তারাও ঠিকমতো টাকা পায় না। অনেক খারাপ অবস্থায় থাকে।

অর্জিত : আমার কথা হল, আপনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সাকসেসফুল নন। কিন্তু একটু অন্য জায়গা থেকে বলি। যদি এক হিসাবে কেউ মনে করে যে সুনীল বেশ আরবান ছিল, যতটা ভাবছি ততটা খারাপ নয় ?

উৎপল : হ্যাঁ, সুনীল আরবান ছিল ; আমি নিজেকে রুয়াল, আরবান, ঘোর বাঙালি বা ইয়োরোপীয় এর কোনোটা হিসেবেই ক্লেইম করি না। কেন না সবসময় একটা দোলাচল, এটা থেকে ওটার মধ্যে আমি শিফট করেছি। যে বলছে, সে নিজেই ‘আরবানিটি’ বলতে কী বোঝে, ‘ইয়োরোপ’, ‘স্মার্ট’নেস’ বলতে কী বোঝে, এগুলো নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে অনেক। ইয়োরোপ যেমন আমাদের ভুল বদ্বল থাকে, আমরাও তেমন ইয়োরোপকে ভুল বদ্বল থাকি। ইয়োরোপের বহু কিছু জিনিস আছে যার খবর আমরা পাই না খালি ওইসব চকচকে বই দেখার ফলেই। ওখানেও বহু লোক রাস্তায় শূন্য থাকে, বহু লোক লিটল ম্যাগাজিন বের করে—অনেক কিছুই এখানকার মতো। সামগ্রিকভাবে ইয়োরোপকে ধরা খুব কঠিন যেমন, ষাট-সত্তর-এ প্যারিসকে মার্কেট প্লেস অব আইডিয়াজ বলা হত। প্রত্যেকদিন নতুন নতুন বিষয়ে নতুন তর্ক—তাকে চ্যালেঞ্জ করা, নাকচ করা এইসব চলত। গোটা ফিল্ম-আন্দোলনে ষাট এর শুরুরদে কিছু এথনোগ্রাফিক ফিল্ম দেখানো হয়।

সমাজতাত্ত্বিকরা আফ্রিকায় গিয়ে এইসব ছবি তুলেছিলেন। ছোট ছোট এই ছবিগুলো হলে মনিং শো-তে দেখানো হত। ছবি দেখে ফরাসি দেশে একটা নতুন আন্দোলন শুরু হল। ‘নুভেল ভাগ’—নতুন ঢেউ। গোদার, রোব-গ্রীয়ে, গ্রুফো এঁরা সবাই ওই এথনোগ্রাফিক ফিল্ম-এর সন্তান। এর পরে পিটার ব্রুক আফ্রিকার একটা উপজাতির মধ্যে রিচুয়ালস এর মতো নাটক ধরনের একটা জিনিস দেখলেন—কনফারেন্স অব দি ক্রোজ—কাকেদের সম্মেলন। উনি এটা নিয়ে নাটক করলেন। এটা আমি স্টেজে দেখেছি অভিনীত হতে, কোনো কথা নেই, শব্দ অভিব্যক্তি, দৃশ্যটা ধরে কালো পোশাক পরে কাকেদের মতো ঘোরাফেরা, ভাঙ্গা ইত্যাদি। মহাভারত করার সময়ে পিটার ব্রুক এদেশে এসেছিলেন এবং ছোট-নাচ দেখেছিলেন। এর প্রচুর মন্ডমেন্ট উনি ব্যবহার করেছেন। ওঁর মহাভারতে ভীমের প্রবেশ যেভাবে দেখানো হয় তা বিস্ময়কর। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে ভীমের মার-প্যাঁচ-বীরত্বের নানা কলাকৌশলের প্রদর্শন চলে। আমাদের এখানে তো এভাবে দেখানো হয় না। সেই কথাই বলি—ইয়োরোপ যে রকমভাবে আমাদের বোঝে, আমরা সেভাবে বুঝি না, আমরাও তেমন একভাবে ইয়োরোপকে বুঝে থাকি—ভুল-ঠিকের কথা আলাদা।

আইরিশদের সঙ্গে আমাদের একটা চরিত্রগত মিল আছে। কথা বলা আর সাহিত্য ছাড়া ছবি, গান ইত্যাদি ওদের নেই। আমাদেরও একই সম্বল, বাঙালির ছবি নেই, নাচ নেই, একেবারে শূন্য—মানে ‘কুড হ্যাব বিন বেটার’—এরকমও বলা যাবে না। অথচ পাশের রাজ্য উড়িষ্যা—সেখানে লোকের নাচ, স্থাপত্য ইত্যাদিতে দারুণ পারদর্শিতা। কী করে হয় এটা? কিছু কিছু কারণ আমি অনুমান করতে পারি। আমরা, বাঙালিরা হাচ্ছি ভগ্নস্কর-ভাবে মিশ্র—সংকর জাতি। সংকর জাতির যা-যা চরিত্র সবই আমাদের মধ্যে রয়েছে। হট-টেম্পারড, হাইলি ইমোশনাল, কোনো কিছুতে স্টিক না করা, ডেসট্রাক্টিভ ভ্যান্ডালিজম—সুন্দর জিনিসকে নষ্ট করে ফেলা—এসব আমাদের বৈশিষ্ট্য।

মন্দির না থাকলে নৃত্য হয় না, আবার স্পেস না থাকলে মন্দির হয় না। অন্যান্য অনেক রাজ্যেই বিস্তৃত স্পেস রয়েছে, যেমন উড়িষ্যা, পাহাড় পাবেন, সমুদ্র পাবেন, যেটা ভৌগোলিকভাবে এদিকে, বাংলায়, ততটা নেই। ভৌগোলিক কারণ ছাড়াও, হিউম্যান সেটলমেন্ট-এর প্যাটার্ন-টাও দেখতে হবে। এখানে বসবাসের ধরন ছিল অনেকটাই ট্র্যানজিটারি...

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর একটা তত্ত্ব আছে। তাঁর মতে, গোটা উপকূলবর্তী অঞ্চল জুড়ে বাঙালির সামুদ্রিক বারিগা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অথচ আমাদের লেখালিখিতে সমুদ্র

সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চাঁদ-সদাগর ইত্যাদি যা আছে তা লৌকিক গল্প মাত্র।
এর কারণ আমার জানা নেই।

এইসব বিষয় নতুন প্রজন্মের গবেষকদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

রাঘব : রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে বাংলা সাহিত্যের কথা ধরা যাক। দুটো ধারা— একটা লোকায়ত আর একটা সংস্কৃত সাহিত্যকে উৎস ধরে এক ধরনের গদ্যচর্চা। রবীন্দ্রনাথ আসন্ন বাংলা ‘আধুনিক’ হল। তাতে আমাদের ভাষা কি তার সহজ, স্বাভাবিক পরিষ্কার-অন্তে আধুনিক হয়েছে নাকি বড় মাপের প্রতিভার চাপে আকস্মিকভাবে প্রায় ‘নির্বাকের স্বপ্নভঙ্গ’-এর মতোই বাংলা ভাষা আধুনিক হয়ে উঠল? ফলে আমাদের গদ্য ভাষায় যে নানারকম প্রকাশভঙ্গি ছিল সেটা এমনভাবে স্ট্রিমলাইনড্ হয়ে গেল যে সব কথা আর সেভাবে বলাই যায় না?

উৎপল : এটা খুব বড় একটা ক্যানভাস। প্রথমত ভাবার আছে— রবীন্দ্রনাথে একটা যুগের শেষ ও আর একটা যুগের শুরুর। সমান্তরাল একটা প্রসঙ্গ উদাহরণ-স্বরূপ বলি। আপনারা জানেন, ইয়োরোপে খ্রিস্ট-ধর্ম যাওয়ার আগে, যিশুর জন্মের ২০০-৩০০ বছর পরে, বহু প্যাগান ধর্মচারের প্রচলন ছিল। এইসব ধর্মের একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল শরীর (Body)— শরীর-কেন্দ্রিকতা (Body-oriented)। এই সময়ে (৩৪০-৩৫০ খ্রি.) উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ থেকে অগাস্টিন নামে এক কিশোর রোমে এসে, খ্রিস্ট-ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি সময়কালে ডকট্রিন, ডগ্মা, রিচুয়ালস্—ইত্যাদি তৈরি করলেন। বাইশ ভল্যুমে সেই গ্রন্থাবলীর নাম ‘সিটি অফ গডস’। শুরুর হল হেরেসি— যারা অগাস্টিনিয়ান মতবাদে বিশ্বাস করে না তারা হেরেটিক— তাদের জন্য শারীরিক অত্যাচারের বিধান দেওয়া হল। সেন্ট অগাস্টিন আত্মার পরিশুদ্ধির (soul-কে refine করা) কথা বললেন। এর আগে গ্রিক ধর্মচর্চায় শরীরের প্রাধান্য ছিল, সৌন্দর্যবোধের কেন্দ্র ছিল শরীর। এমনকি শরীর-সংক্রান্ত ভাবনা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে হোমো সেক্সুয়ালিটি, লেস্‌বিয়ান লাভ ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড। উনি সমস্ত জিনিস একেবারে গোড়া থেকে কেটে দিলেন। রোমে এসে তিনি কৈশোরে দেখেছিলেন লোকেরা সব মনে মনে পড়ে। উনি এতে অবাক হলেন। উনি জানতেন জোরে পড়াটাই একমাত্র রীতি। তখন উনি এক নতুন সত্যকে আবিষ্কার করলেন— তাহলে মানুষের মনকে স্পর্শ করার কোনো একটা নীরব উপায় রয়েছে। এটা অনেকটা ওয়াল থেকে রিটেন্ কালচারে আসার মতো বৈপ্লবিক ঘটনা। কিন্তু প্যাগান, অগাস্টিন দেহবাদীরা তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়, অনেকটা আমাদের তান্ত্রিকদের মতো। ভূত-প্রেত ডাইনিং ইত্যাদি নানা অকাল্ট (occult) জিনিসে তারা আশ্রয় নিল। ৪০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গোটা ইয়োরোপের

ইতিহাসটাই হচ্ছে বিধর্মীদের উপরে নির্মম অত্যাচারের ইতিহাস— তাদের খ্রিস্টান মতাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা, দেহবাদীদের কৃচ্ছসাধনের পথে নিয়ে আসার চেষ্টার ইতিহাস। ১২০০-তে শূরু হল ক্রুসেড (Crusade) এবং ওই সন্ধুযোগে হেরেটিকরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। রাজভঙ্গ, ধর্মভয় দিয়ে যা চেপে রাখা হয় তার বিরুদ্ধে কীরকমভাবে নতুন নতুন প্রতিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে— পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলে সেসবের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাবে। এইসময় দক্ষিণ ফ্রান্সে ‘গ্রুবাদুর’ সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। যিশু নয়, ভগবান নয়, ওই জানালায় বসে থাকা যে মহিলা, তারই উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হল গান। গ্রুবাদুররা ছিল যাযাবর ধরনের, অনেকে বলে সিরিয়া থেকে ভারতবর্ষ ঘুরে তারা ফ্রান্সে গিয়েছিল। একদিকে যেমন ধর্মযুদ্ধ শূরু হল, অন্যদিকে গ্রুবাদুর কবিরা গোটা ধর্মযুদ্ধের যে উদ্দেশ্য, খ্রিস্টান ধর্ম যা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করছিল, তা পুরো ধসিয়ে দেওয়া বলতে যা বোঝায়— তা-ই করল। কবিদের এমন একটা মারাত্মক ক্ষমতা আছে! তারা সমাজের মধ্যে একটা সাবভারসিভ রোল (subversive role) প্লে করতে পারে। উপরে যা মেনে নেওয়া হচ্ছে, ভিতরে ভিতরে কবিরা তা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিতে পারে। আরও বিস্তৃতভাবে বলা যায়, যে কোনো সভ্যতা যখন খুব বড় ধরনের হয়ে ওঠে, তখন তার ভিতরের ধ্বংসের বীজ গাছ হয়ে বিকশিত হয়। এই ফেটালিজম (fatalism) জগতজুড়ে, সব ইতিহাসে দেখা যায়। কিন্তু এখানে পাইয়োনায়ার হচ্ছে কবিরা। তাঁদের ছবি-আঁকিয়েদের মতো মাল-মশলা নিয়ে ঘুরতে হয় না, লেখার জন্য এক টুকরো কাগজ পোন্সিল হলেই হল। আর ওই ওর্যাল সাহিত্যের যুগে কবিরা কোথায় কাকে কী বলে বেড়াচ্ছেন, কী ছড়া কাটছেন, গান বাঁধছেন তাও নিয়ন্ত্রণের উপায় নেই।

এই যে দেহ ও দেহজ প্রেমকে ভিত্তি করে রচিত গ্রুবাদুর সাহিত্য—এর মধ্যে যিশুর উল্লেখ পর্যন্ত নেই, ধর্মীয় চিন্তার লেশমাত্র নেই, আমি ও আমার প্রেমিকা— এটাই প্রধান। একে কিছুটা রোমান্টিক বলা যেতে পারে। এই ধারার সম্ভব ঘটল দাস্তের মধ্যে। দাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক মানসিকতার শূরু। এই মধ্যবর্তী অবস্থানের জন্য তাঁর গদ্যরসকে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথেরও অনেকটা তাই। আমরা তর্ক তুলতে পারি, রবীন্দ্রনাথে মধ্যযুগ শেষ হচ্ছে না আধুনিক মানসিকতার সূচনা হচ্ছে?

রবীন্দ্রনাথের সাবভারসিভ রোল বদ্বাতে গেলে তাঁর পূর্ববর্তী যুগটাকে আমাদের বদ্বাতে হবে। বস্কিমচন্দ্র প্রমুখ যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ কি একদিক থেকে তা সাবভার্ট (subvert) করেননি? ওঁর মূল্য শিক্ষাব্যবস্থার চিন্তা, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা— এগুলোকে

একট্রা লিটারারি অ্যাকর্টিভিটি হিসাবে না দেখে গোটাটাই তাঁর ক্রিয়েটিভ জীবনের অঙ্গ হিসাবে দেখা উচিত। আর ভাষার আধুনিকীকরণ প্রসঙ্গে বলতে পারি যে আধুনিক মনের অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে দ্বিধা বা ডায়লেমা (dilema), রবীন্দ্রনাথের আগে সাহিত্যে যার কোনো চিহ্ন নেই। নোবেল পুরস্কার পাবার পরে এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে নাকি প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'What is your greatest virtue?' উনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'Inconsistency', আর 'What is your greatest fault?'—এ প্রশ্নের জবাবেও বলেছিলেন, 'Inconsistency'। এইসব সূক্ষ্মতা উনিই প্রথম বুঝতে পারেন। এই ধরনের চিন্তা শুধু সাক্ষাৎকারে নয়, তাঁর গানে, সাহিত্যেও প্রকাশিত হতে দেখি। শেষের দিকের লেখাগুলো অন্তত সব কনট্রাডিকশন-এ ভরা। A Man full of contradictions. A Man who is very proud to say/express, 'I am full of contradictions'। এই হচ্ছে আধুনিক মন। মধ্যযুগের প্রতিটি মানুষ হচ্ছে নিশ্চিত মানুষ। বিদ্যাসাগর, বিষ্ণুমচন্দ্র এঁরা তাই। মধুসূদন সম্পর্কে অবশ্য আমার জানাটা কম। তাঁর সম্পর্কে একটাই কথা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের মতো কনট্রাডিকশন—এই আধুনিকতা তাঁর লেখায় ছিল না।

...

একটু আগে, একটা যুগের শুরুর ও একটা যুগের শেষ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলছিলাম। এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রতিভাবান কেউ দাবি করতেই পারেন যে তিনিই এটা ঘটিয়েছেন। যেমন দান্তের ক্ষেত্রে বলতে পারি। আবার মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক এর মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ, উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন ইত্যাদি ব্যাখ্যা খুঁজবেন, কেউ হয়ত অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ঘটেছিল কিনা দেখবেন, এরকম বহু ফাংশনাল (functional) ব্যাখ্যা হতে পারে। তবু রহস্যের সমাধান হয় না। একটা যুগকে আমি বুঝব কী করে? আমাদের দেশে যেমন চৈতন্যদেবে মধ্যযুগের সূচনা এবং রবীন্দ্রনাথে এর শেষ। এখন রবীন্দ্রনাথে মধ্যযুগের শেষ না আধুনিক যুগের শুরুর—এ প্রশ্ন উঠতেই পারে।

রাঘব : মধ্যযুগে আমাদের সাহিত্য মোটামুটি ঘরে ঘরে পৌঁছত। আধুনিক যুগে যখন চলে আসছি তখন সাহিত্যকে মাইনরিটি-র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখছি। এটা কি তাহলে আধুনিকতার একটা লক্ষণ যে ভাষা মার্জারিটি-র কাছে পৌঁছবে না? বা যখন সেটা বাজার-অর্থনীতি অনুসারী হয় তখন পৌঁছয়? যখন সেটা তরল হয়ে ওঠে? যখন সে ভাষায় গ্রাম্য, তরল সব উপাদান ঢুকে পড়ে আর বহিরগে আধুনিকতার একটা আবরণমাত্র থাকে তখন পৌঁছয়? না হলে তো বলব এটা একটা রিগ্রেশন!

উৎপল : এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে বেশ কঠিন, কেন না এটাও আমার মনোজগত বা চিন্তাজগতের বাইরে। এ নিয়ে আমি ভাবিনি। বহুদ্রকম ফাংশনাল বা কেজো কারণ অবশ্য আমরা খুঁজে বার করতে পারি। যেমন বাণিজ্য, প্রচার ইত্যাদি। আর বহু ক্রিয়েটিভ জিনিস আছে যা আমাদের মনোজগতের গভীরের বস্তু। যার জন্যে, প্রচার অতটা না থাকা সত্ত্বেও নজরুল এখনও এখানে গানের বা একটা মানসিকতার প্রবন্ধ— তা খারাপ-ভালো যাই হোক না কেন। এটা খুব ভালো বোঝা যায় জনপ্রিয় জিনিসগুলোর দিকে লক্ষ করলে। গানের ব্যাপারে বিশেষ করে যৌনতার একটা বিরাট ভূমিকা আছে। গান বা গান-জাতীয় যা কিছু জনপ্রিয় হয় তার মধ্যে যৌনতার ভূমিকা যে কতটা তার হিসাব এখনও আমরা করে উঠতে পারিনি। যে ডার্ক ফোর্স-এর কথা আমি বলছিলাম, তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে সেক্সুয়ালিটি। ভিটগেনষ্টাইন একসময় বলেছিলেন যে আমাদের গোটা চৈতন্য বা বোঝা-টোঝার ব্যাপারটা হচ্ছে একটা দড়ির মতো। তার অনেক-গুলো স্ট্র্যান্ডস (strands) বা সূতো রয়েছে, সূতোগুলো মিলে দড়িটা তৈরি হয়েছে, কোনো একটা সূতাকে যদি আলাদা করি সেটা সহজেই ছিঁড়ে যায়, কিন্তু সূতোগুলো একসঙ্গে মিলে শক্ত দড়ি তৈরি করে।

অজিত : আচ্ছা, এটা শব্দ গানে কেন, এতো কবিতা, প্রবন্ধ সবকিছুরই হবার কথা—

উৎপল : হ্যাঁ, কিন্তু বাঙালিদের সাংস্কৃতিক অবদান বলতে দুটো— সাহিত্য আর গান। গান মানে সাহিত্য-নিয়ন্ত্রিত যে গান। ধ্রুপদী গান নয়। ধ্রুপদী গানেও আমরা বেশ দুর্বল। কেউ হয়ত ফিল্মের কথা তুলবেন। কিন্তু এখানে ফিল্মও তো সাহিত্য-নির্ভর। স্বাধীন-ছবি করার কথা এখন অবশ্য কেউ কেউ ভাবছেন।

রাঘব : এটা বোধহয় স্বীকার করতেই হবে যে সং ভাবে সাহিত্যচর্চা (authentic literature) বলতে যা বোঝায় তার অভাব খুবই দেখা যাচ্ছে। সৃষ্টি কাকে বলব? যা নতুন, তাকেই তো? গদ্যে বছরের পর বছর ধরে একটা চর্বি-চর্বি দেখে যাচ্ছি। উপন্যাসের সংজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করা হয় না, নতুন মায়া যুক্ত হয় না, একই জিনিস লিখিত হয়ে চলেছে, তা নিয়ে আলোচনা, প্রশংসাও হচ্ছে যা সাহিত্যের জায়গা থেকে নয়। ধরুন, সমাজ সম্পর্কে আমার কিছু মতামত আছে এবং আমি একজন পীর। 'টারজান' জাতীয় গল্প লিখে বললাম এটাই আধুনিকতা, পরচা-পাট্টা ইত্যাদিতে যা আছে সেটাই আমাদের সমাজ। এমনকি আমাদের খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত আধুনিক নয়; যদি হত তাহলে সাংবাদিকতা জিনিসটাও অত্যন্ত সাহিত্যের প্রান্ত ছুঁয়ে থাকত। সেক্ষেত্রে অবশ্য যারা সাহিত্যের নামে সাংবাদিকতা করে তাদের পেশা পরিবর্তন করতে হত। চার্লশের তথাকথিত প্রগতিশীল

সাহিত্য, যা সামাজিক তথ্যগুলোকে সাহিত্যের মাধ্যমে জানাবার চেষ্টা করেছে এবং কিছুটা বাজার পেয়েছে, এখন সে ধরনের সাহিত্যকেও মেইন স্ট্রিম গ্রাস করে নিয়েছে, ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘ছোটলোকের যৌনতা’-র গল্প ছাপা হচ্ছে। তাহলে সৃষ্টি কোথায় হচ্ছে? আর সৃষ্টি যে হচ্ছে না, তা নিয়ে সাহিত্যিক-মহলেও কোনো গোলযোগ নেই; তাহলে কি খেতে-পরতে পেলে আর বাজার চললেই হল? অবস্থাটাকে আপনি কী রকম মনে করছেন? হতে পারে, একটা সময়ে হয়ত কোনো আঞ্চলিক ভাষায় এরকম সঙ্কট আসে, কিন্তু তা নিয়ে বেদনাবোধ তো থাকবে?

উৎপল : এর বিভিন্ন স্তর আছে। স্তরগুলো আবার পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যা আলাদা করা মূর্শকিল। প্রথমত, এটা বাংলা গদ্যের সমস্যা। বাংলা গদ্য কোনো সময়েই বাংলা কবিতার কাছাকাছি আসেনি, চিরদিনই একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। অবশ্যই ব্যতিক্রমী হলেন দ্বু-জন। প্রথমজন রবীন্দ্রনাথ, যদিও তাঁর সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে; দ্বিতীয় জন সম্পর্কে আশা করি মতভেদ নেই, তিনি—কমলকুমার মজুমদার। এঁদের পাশে অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে দ্বু-চারজনের নাম করা যায়। গদ্য, আমাদের ক্ষেত্রে, সবসময়েই রুট ছুঁড়ে দিয়ে কুকুরকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার মতো একটা চালাকি করে এসেছে। যাতে কুকুর আমাদের না কামড়ায়। রিয়ালিটি হচ্ছে ওই ছুঁড়ে দেওয়া রুটটি। আর আমার যা যা করার তা যেন ঠিক ঠিক মতোই করতে পারি। কুকুর রুট খেয়ে যাক, আমি যেন পরোটা-মাংস খেতে পারি। গদ্যকে দিয়ে এ কাজটা করানো বাঙালির সাহিত্যে গ্রেটেস্ট ক্রাইম। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; প্রত্যেক গদ্যলেখক এই ক্রাইম-এর অংশীদার। সৌভাগ্যবশত, সত্তর-এর পর থেকে, তখন যে সমস্ত রাজনৈতিক সচেতনতা এসেছিল, মূলত তারই অবদান হিসাবে গদ্যলেখকরা সচেতন হয়েছে যে এ ক্রাইম-এ আমার অংশ না নিলেও চলবে। নিতে পারলে অবশ্য খুবই ভালো, ওই যে বই বিক্রির কথা বলছিলাম—যদি প্রোফেসর শঙ্কুর মতো একটা চরিত্র সৃষ্টি করতে পারি, তাতে দশলক্ষ কপি বিক্রি হবে। সমস্ত চোরাই গল্প, চোরাই গল্পের চোরাই গল্প, চোরাই ব্যবসা, চোরাই পয়সা, হাতে নিতে ঘেন্না হয় এইরকম ধরনের বই চালু হয়েছে। সুন্দর কাভারে সুন্দর ছাপা ইত্যাদি—মাল যত চোরাই তত সৌন্দর্য বেশি। ভাগাড়ে মৃতদেহ পড়লে যেমন শকুনের অভাব হয় না তেমন ফিল্ম-মেকার, ছাপাই-ওয়াল, প্রচ্ছদ-আঁকিয়ে ইত্যাদি বহু লোক এসে গেছে। এদের সম্মান দিয়ে বলছি—এরা শকুন ছাড়া আর কিছু নয়। সম্মানিত শকুনেরা সব গাছের ডালে বসে আছে কেন না ভাগাড়ে একটি মৃতদেহ পড়েছে—পুজো সংখ্যার নতুন উপন্যাস; কিছু খোরাক আছে কিনা

দেখা যাক, সিনেমা যদি হয় তবে হয়ত ফ্রান্স-জার্মানির গ্রাম্য কোনো পুরস্কারও জুটে যেতে পারে। এই ছকের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে।

এর আর একটা খারাপ দিক হল, এতে সমাজের মধ্যে একটা পিছটান জন্ম নেয়, রক্ষণশীলতা আসে। আমরা পুরনো দিনের লেখা পড়ব, মধ্যযুগে ফিরে যাব, পদাবলী পড়ব— সেনসিটিভ লোকেরা এইসব পিছটানের দিকে চলে যায়। সং সাহিত্যবস্তুর খোঁজে তারা আজ রামপ্রসাদ, সাধক কমলাকান্তের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অংশত কমলকুমারকেও শেষজীবনে এই সব জিনিসে আশ্রয় খুঁজতে দেখা গেছে। আমি এই প্রবণতার বিরোধী। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ১৯৯৪-তেই থাকতে চাই, ১৮৯৪-এ যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে কারণে আমার অনেক ড্র ব্যাকস্ (drawbacks) আছে। আমার জনপ্রিয় না হবার অন্যতম কারণ হচ্ছে এটা। অনেক সমালোচিত হয়েছি আমি এ জন্যে। সত্যিই তো, আমি কি মাথার নিচে একটা নরম বালিশ খুঁজে পাব না, যদি পাঁচশো বছর আগের চৈতন্যচরিতামূর্তে ফিরে যাই?

একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসছে যে একজন প্রধান লেখক— তার অবস্থানটা কোথায়? তার সংস্কৃতি, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে? আমাকে প্রশ্ন করা হতেই পারে— কেন প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু নিজেকে সবসময় প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে ভাবাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে তো ছিদ্রাবেষী, তিস্ত, কলহপরায়ণ, প্রত্যেকের দোষ দেখা— এরকম একটা চরিত্রে ফিরে যেতে হয় যা একপ্রকার আত্মহত্যার সামিল। এই মৃত্যু আমরা ঋষিকের ক্ষেত্রে দেখেছি। একসময় থিয়োরি ছিল, ক্রিয়েটিভ লোককে যদি কাজ না করতে দেওয়া হয় তাহলে তার ক্যানসার হবে। অতটা জানি না, এটুকু বলতে পারি, মনের দিক থেকে সে ডিজেনারেট (degenerate) করবেই, মানসিক অসুখ হবে। কাউকে ধ্বংস করতে হলে আগে একটা উপায় ছিল তাকে ক্রিয়েটিভ কাজ না করতে দেওয়া। এই যে তথাকথিত বাণিজ্য বা সফলতার জগত, তারও কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে ক্রিয়েটিভ লোককে কাজ না করতে দেওয়া, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়ে তাকে এইভাবে ধ্বংস করা। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের কাজ হচ্ছে তাকে এড়িয়ে চলা— ‘আমি তোমার আইনে, তোমার গ্রাউন্ডে খেলব না, অন্য গ্রাউন্ডে খেলব।’ এই হচ্ছে ক্রিয়েটিভ লোকের ধূর্তাণি, এই ধূর্তাণি করেই তাকে আজকে বাঁচতে হবে, টিকে থাকতে হবে। এই হচ্ছে তার চ্যালেঞ্জ। তার সাবভারসিভ রোল... তার আন্ডার-গ্রাউন্ডে চলে যাওয়া... সাংস্কৃতিক ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করা...

অর্জিত : আপনি লিখেছিলেন ‘বসন্তে এনেছি আমি হাবা যুবকের হাসি’। সেই হাবা যুবকের এরকম একটা ইমেজ আসত আমাদের কাছে : একজন প্রতিবন্ধী

ছেলেকে মা নিয়ে গিয়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেনস্-এ, সে দেখছে বসন্ত, তার হাসি ফুটে উঠেছে ইত্যাদি। এখানে আপনি 'আমি' শব্দটা আনলেন, দাবি করলেন যে আমি হাসাচ্ছি ওই হাবা যুবককে, আমি ওর উপরে ঈশ্বরের মতো, আমি লেখক, কবি আর হাবা ছেলেটা তাকাচ্ছে, তার কাছে কবিতার বই এসেছে, আপনার কিংবা জীবনানন্দের—সেখানে অন্তত একটা বিস্ময়। আপনার 'পদুরী সিরিজ' পড়ে আমার মনে হয়েছিল—এটা ঠিক বুদ্ধিতে পারছি না, ধরতে পারছি না, কিন্তু একটা অন্তত হাবা হাসি, বিস্ময় আসে—যে এটা ডিফারেন্স। এর ম্যাজিকটা ধরা—যেন চ্যালেঞ্জ করছে—এই যে হাবা হাসির কবিতাগুলো আমি একটু একটু বুঝছি। এই হাবা হাসির জায়গা থেকেও তো একটা সাহিত্য হয়। আপনারা পাঠকশ্রেণী ও প্রতিভাবানের জায়গা থেকে দেখেছেন; আজকে প্রতিভাবান সেরকম আসেনি, দশপনের বছর পরে হয়ত তার জায়গাটা তৈরি হবে। আজকে কিছু হাবা ছেলে হয়ত সুইসাইড স্কেয়াড-এর কাজ করবে। কিছু পত্র-পত্রিকা তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টাগুলো ধরে রাখবে, তারা মরে যাবে। তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ শূন্য বাজারি সাহিত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া নয়। সন্দীপন, উৎপল থেকেও বেরিয়ে যাওয়া, ক্যামু, সার্থ থেকে বেরিয়ে যাওয়া—তাকে নতুন আনতে হবে। এক ধরনের লেখালেখি আছে যাকে আমার পরিভাষায় বলব Parasitical, Parricidal বা Patricidal writing। Parasite-এর মতো বেড়ে উঠছে, তারপর তাকে গুলি করে মারছে—

উৎপল : বুঝে নিই—গুলি করে মারছে মানে তারা যে লেখায় অনুকরণ করছে বা সেই পথ ধরে চলার চেষ্টা করছে, সেটাই অরিজিন্যাল কবিকে মারার চেষ্টা?

অজিত : তাতে একটা জায়গায় দেখছেন যে সে আপনাকে অস্বীকার করছে। আপনাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করছে কিন্তু হঠাৎ আপনাকে ইনটারোগেট করতে শুরুর করেছে। এককাল হয়ত আপনাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করেছিল, হঠাৎ ইনটারোগেট করা শুরুর করেছে—

বিনয় : যেখান থেকে তুমি উৎপল বস্তুকে দ্বিতীয় পোস্ট মডার্নিস্ট কবি বলেছ?

অজিত : সেটা সম্পূর্ণ আমার নিজের কাছে—

উৎপল : দ্বিতীয় বলার একটা সর্বাধিক হাফে প্রথমটা কে সেটা—

অজিত : প্রথম জীবনানন্দ দাশ। আর কে হবে। কিছু কিছু লেখক থাকে তারা সবসময়—যেমন সার্থ লিখেছেন মালার্মে নিয়ে, দেরিদা লিখেছেন মালার্মে নিয়ে, মালার্মে আধুনিকতা এবং উত্তর-আধুনিকতার একটা বর্ডার লাইন। যারা পড়াশোনা করছে তারাও কিন্তু আপনাকে ওইভাবে সিরিয়াসলি নেয়—যে, এর থেকে আমাদের ভ্রম করতে হবে, এর থেকে আমাকে বুদ্ধিতে হবে, এর

লিখনভাগিয়ার চার্ম-এ আমি পড়ে যাব না, তাহলে সেটা আমাকে গিলে খাবে, আমি মরে যাব—

উৎপল : পয়েন্টটা আমি বুঝতে পেরেছি। এটা হয়, যে একই লেখক কিন্তু দুই পর্যায়ে, যার আগে একটা pre-যুগ গেছে, পরে একটা post-যুগ আসছে, যাকে বলে বিভাজক ধরনের একজন লেখক— তার ক্ষেত্রে। তবে এখানে আমারও প্রশ্ন আছে। আমার মনে হয় এতে লেখাকে, সাহিত্যকে যান্ত্রিক-ভাবে দেখার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। একজন লেখক তাঁর হবার পিছনে শুধুমাত্র সাহিত্য বা লেখা তো কাজ করে না, আমার নিজের ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যের ভূমিকা নগণ্য— কিন্তু আমি অন্যান্য বহু সোর্স থেকে নিয়েছি, যেমন ক্রাফট-এর কথা বলেছি। নিজের সাইকো-লিংগুইস্টিক যে জগত, তার বাইরে অন্যের ভাষার ব্যবহারও আমার কবিতায় আছে, একটা বাক্য নয়, গোটা chunk তুলে দেওয়া হয়েছে। যেমন একজন চালওয়ালি কী ভাষায় কথা বলে, তার ভেতরে সে কী জগত প্রকাশ করছে সেটা আমি টেপ-রেকর্ডারের মতো তুলে নিয়েছি, অচেতন বা অবচেতনভাবে কিছু ঝাড়াই-বাছাই নিশ্চয়ই করেছি। কিন্তু আজকাল যেটা হয়, হয়ত বয়স বাড়ার ফল, আমি বহু কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, দুপুরবেলায় বাড়িতে যখন কিছুটা নিঃসঙ্গ থাকি, ঘুঁমিয়ে পড়লাম হয়ত ৩/৪-টের সময়, তখন আমি যে সব গলা শুনতে পাই সে সব আমি ছেলেবেলায়— যখন বালক ছিলাম তখন শুনছি। এইভাবে এক-ধরনের অডিও-ইমাজিনেশন কাজ করে। ছেলেবেলায় আমার হাতের লেখাটা ভালো ছিল, ভূজপত্র, কলাপাতায় লেখা ইত্যাদি কিছুটা রপ্ত করেছিলাম। ক্যালিগ্রাফির একটা প্রবণতা ছিল। এর জন্য ছেলেবেলায় স্কুলে মারও খেয়েছি আমি। আঙুলের তিনটে ফাঁকে তিনটে পেন্সিল ধরে নিজের নামটা লিখলে সুন্দর রেখাও পড়েছে, সুন্দর ডিজাইন-ও তাঁর হচ্ছে, এসব আবিষ্কার করেছিলাম। এতে আমার মাস্টারমশাই প্রচণ্ড মেরেছিলেন। পরে বিলেতে গিয়ে দেখলাম রিজিত রাইলী নামে এক ভদ্রমহিলা ওই ধরনের নকসা করে জগৎবিখ্যাত হয়েছেন। তাঁর করা লোগো ইত্যাদির ডিজাইন সব ওই ৪/৫-টা তুলি একসঙ্গে ধরে করা, উনি সম্ভবত হাতের বদলে কাঠের তাঁর হাতের মতো যন্ত্র ব্যবহার করতেন। ক্যালিগ্রাফি-র এটা একটা প্যাটার্ন, অনেক সময় ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিতে এটা দেখা যায়।

আর একটা জিনিস— আমি ছেলেবেলায় অনেকের চিঠি লিখে দিতাম। গায়ের বড়ো-বুড়ি, যারা লিখতে পারত না, পুজোর সময় একটা পোস্ট কার্ড এনে বলত, জামাইকে লেখ সে হারামজাদা! আমাকে পুজোর টাকাটা এখনও কেন পাঠায়নি। সম্বোধন হচ্ছে ওই ‘হারামজাদা’; আমি তো তা লিখতাম না, খানিকটা সেনসারিং করে নিতাম। ‘হারামজাদা’ তো লিখতে পারি না, আমি

লিখতাম ‘প্রিয় সুবোধ, কেমন আছ, ভালো আছ, টাকা পাঠাইও’—এইরকম করে, সাহিত্য করে লিখে দিতাম। এই যে সব নন-লিটারারি ভয়েসেস্—এগুলো আমাকে এই প্রোডুসে, খুব হন্ট করে। যার উল্লেখ আমার কবিতায় আছে। এই রিলেশনশিপটা এখনও আমার কাছে একটা রহস্যময় মানব-সম্পর্ক। আর কিছুদিন পর, সাক্ষরতা বাড়লে, তখন আর এইসব চিঠি-লেখানোর বালাই থাকবে না—হাঃ-হাঃ—এই যে লেখার সোর্স, এমন অন্য আর কোথায় পাব? সাহিত্য তো তৃতীয় শ্রেণীর সোর্স, সত্যি বলতে কি, কোনো লেখকই সাহিত্যের কাছে কিছু জানতে বা শিখতে যায় না। পরে, বড় হয়ে, বলে বস্কিম ভালো, রবীন্দ্রনাথ ভালো ইত্যাদি। সে কিন্তু আসলে খোঁজে প্রতিটি পাড়া-প্রতিবেশীর ভাষা, চালওয়ালির গালাগাল, হেন-তেন, বাজারে কে কীভাবে কথা বলছে—এইসব থেকে সে সৃষ্টি করে। মানব-সম্পর্ক অনুধাবন করে।

অর্জিত : এখনকার একটা বিরাট সোর্স কিন্তু ক্রিটিকাল থিয়োরি। শূন্যতে হয়ত অন্তর্ভুক্ত লাগবে। বিদেশে সমাজবিজ্ঞানের ভাষা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। আসলে প্রবলেম-গুলোই এমনভাবে বদলে যাচ্ছে যে একটা জায়গায় গিয়ে সমাজবিজ্ঞানের ভাষা সাহিত্যের ভাষার কাছাকাছি চলে আসছে। ধরা যাক, সমাজবিজ্ঞান এইভাবে মডেলিং করল : একটা টোটালিটি আছে যা পারফেক্ট নয়। এই পর্যন্ত ব্যাখ্যা সমাজবিজ্ঞান করল। যেমন স্টেট, পার্টি ইত্যাদি। এইবার স্টেট-এ যারা পাওয়ার-এ আছে তারা ফাঁকগুলোকে বোজায়, এই ফাঁকের বিরুদ্ধে যারা আঘাত করছে তাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে, এইভাবে আর একটা বৃত্ত তৈরি করে। করতে করতে কিছু লোককে এক্সটেন্ড করছে বলা যায়, সে আর নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে না। ধরা যাক, গ্যাস-চেম্বারে মৃত্যু, কেউ যদি বলে হিটলার তো মারেনি, প্রমাণ কী করে হবে? এটা আমেরিকা—মিহ্রশক্তির প্রচার, অত্যাঙ্কি। বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। কেউ যদি বলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প রাশিয়ায় ছিল—তাকে বলা হবে রিঅ্যাকশনারি। মাস্টারপিস কেউ লিখল কিন্তু ছাপা হল না, লোকে পড়ল না, অ্যাপ্রিসিয়েটেড হল না, তাহলে সে মাস্টারপিস লিখেছে এটা কী করে এস্টাব্লিশ হয়? লজিকালি, কতগুলো জায়গা হয় যেখানে সাক্ষী নেই, বিচারক নেই এবং আমি আমার কেস-(case) টা রাখতে গেলে আমাকে প্যারানয়েড বলা হবে—বাইরে ঠেলে দেওয়া হবে—অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে এই যে টোটালিটি—এই যে বাইরে—একে আমি বলি Margins of the Margins। একটা টোটালিটি আছে, ফাঁক আছে, তার মার্জিন-এ লোক আছে সে মার্জিন-টাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করেছে। বাইরেও, ধরুন, ইমিগ্রেশন-এর মধ্য দিয়ে, ফুকো ইত্যাদিকে সব পাগল সাজিয়ে হোক, আমাদের দেশ থেকে

যারা যাতায়াত করছে— থার্ড ওয়ার্ল্ডের রিপ্রেজেন্টেটিভ হোক —তার মাধ্যমে এটা ঘটছে। থার্ড ওয়ার্ল্ড-এ যে আমি আছি, আমি সেখানে দেখছি একটা ডামি থার্ড ওয়ার্ল্ড, প্রাক্তন কতগুলো অভিনেতা নিয়ে আমাকে সরিয়ে দিয়েছে, তারাই থার্ড ওয়ার্ল্ডের অ্যাক্টিং করে যাচ্ছে। এবারে, আমার কথা আমি কীভাবে বলব? আসল যে savage, লেভি স্ট্রাউস তাকে আউট করে দিলেন, তিনি একটা Savage Mind নিয়ে লিখলেন। স্যাভেজদের মধ্যেও কেউ বেশি, কেউ কম বুদ্ধিমান থাকতে পারে। আমার কাছে কিন্তু এটা ইনস্ট্রাক্ট, হোমোজিনিয়াস একটা স্যাভেজ হয়ে আসছে, স্যাভেজটা আর ব্যক্তি থাকছে না। কী করে সে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করবে? সমাজবিজ্ঞানের এই যে বর্ডার-লাইন-এর ভাষা, এই ভাষাটা তো সাহিত্যিককেও খুঁজতে হয়। মার্জিন-এ বলতে গিয়ে তাদের হাতড়ে বেড়ানো যে ভাষাটা, সেই ভাষা একটা ইমপ্যাক্ট আনছে। মার্জিন-এ থাকা লোকদের অনুভূতি, তাদের নিজেদের মধ্যে করা গল্প, গালাগালি করা, যারা পাওয়ার-এ আছে তাদের প্যারোডি করে কথা বলা— এ-সবের মধ্যে নতুন ফর্মগুলো আছে। সেখান থেকে তুলে আনা যায় কী করে, সেই চেষ্টা চলছে, সে চেষ্টা যে খুব সফল হচ্ছে তা বলব না, মডেল-এর জায়গা থেকে পূরনোদের লেখা পড়ছে, ওইখান থেকেই যে তুলব তা নয়, কিন্তু হ্যাঁ, এরা ভালো লিখেছিল, আমাদের তা থেকে অনেকটা শেখার আছে, কিন্তু এরা আমাদের গুরু হতে পারে না।

উৎপল : এখানে একটা ক্লাইসিস-এর কথা উঠছে। সেটা হচ্ছে 'self' বলে যদি আমরা কিছু মেনে নিই, তাহলে একটা 'other'-কেও মানতে হয়। 'self' এবং 'other'-এর মধ্যে যে অ্যান্টাগনিষ্টিক সম্পর্ক, এটা পশ্চিমী ভাবনার দৌলতে আমরা ভালোভাবে জেনে গেছি। 'other' যেন সবসময়েই 'self'-কে আক্রমণোদ্যত। কিন্তু পূর্বা ভাবনায়, ভারত ও চীনে, আমরা 'self' এবং 'other'-কে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে দেখি। এই 'self' এবং 'other'-কে বিভাজন করতে করতে, 'other' এর ভয় দেখাতে দেখাতে পশ্চিমী সমাজ বদলে গেল। এর মধ্যে কবিদের কথা আলাদা, তারা ব্যতিক্রমী, এগুলো কেটে তারা বেরিয়ে আসছে। ফিজিকস্ এবং শুদ্ধ গণিতের চর্চাকারীরাও আসছে। সাধারণভাবে, 'self' এবং 'other'-এর মধ্যে এই বিরোধী সম্পর্ক, পশ্চিমী সমাজের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত রকম মার্জিন-লাইজড্ পিপল্-কেই তারা 'other' বলছে— লেপার, খোঁড়া, পাগল, মেয়েরা, প্রতিটি থার্ড ওয়ার্ল্ড-এর লোক হচ্ছে 'other', এবং 'self' হিচ্ছ আমি, এরা সবাই আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে এবং আমার কাজ হচ্ছে এদের সঙ্গে লড়াই করা। আমার বক্তব্য হচ্ছে, 'self' কখনোই নিজেকে দেখতে পায় না, যতক্ষণ না সে একটা কুকুরের চোখে নিজেকে

দেখে। আমি যতক্ষণ না একজন মেয়ের চোখে নিজেকে দেখছি, একজন তৃতীয় বিশ্বের লোক, একজন পণ্ডা, একজন পাগলের চোখে নিজেকে দেখছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সেলফ কনশাস্‌নেস তৈরি হচ্ছে না— সেলফ কনশাস্‌নেস ইজ নট অটোনোমাস : আমার এ বস্তু অবশ্য অনেকে মানবে না।
 অজিত : না, এটা মানবেই। আমি বরং বলব, ওই 'self' তাই করানোর চেষ্টা করে— 'other'-কে দিয়ে পারমিট করা—

উৎপল : না, সেটা নীতিগত প্রশ্ন। আমি কোনো নীতিবিচারের মধ্যে যেতে চাইছি না। তাহলে দার্শনিকরা চেপে ধরবে, বলবে, এথিক্যাল কনসিডারেশন ইজ অ্যানাদার স্টোরি, তুমি এখানে সেসব প্রশ্ন তুলো না, তার বড়-ঝামেলা আলাদা, তার খেলা আলাদা। আমার বস্তু্য হচ্ছে, একজন ক্রিয়েটিভ পার্সন হিসাবে আমি বড়তে পারি যে যখন রাস্তায় বেরুচ্ছি তখন আমার শত্রু বলে কেউ নেই, 'other' আছে, কিন্তু ওই 'other' আছে বলেই আমি আছি, আমি তার চোখেই নিজেকে দেখছি।

অজিত : 'other' হচ্ছে আমার আয়না—

রাঘব : বা, আই অলসো বিলং টু দ্যাট আদার— এভাবে বলা যায় কি ?

উৎপল : না, এভাবে বললে আবার স্প্লিট পার্সনালিটির প্রশ্ন চলে আসে। হ্যাঁ, স্প্লিট পার্সনালিটি-তে বিশ্বাস করলে আমি বলতে পারি— এ মূহুর্তের আমি আবার পরমূহুর্তেই আমার অংশ ভেঙে গিয়ে আমি— একজন চালওয়ালি।

রাঘব : না, সেভাবে বলছি না। এ পর্যন্ত যেভাবে ভাবা হয়েছে তাতে 'other' বলতে যারা সাবজুগেটেড, মার্জিনাল— তাদের বোঝানো হয়েছে। সাহিত্যের মেইন স্ট্রিম ভাবলে আপনিও তো 'other', মার্জিনাল যখন আপনি হয়েই আছেন, আপনার এই কনট্রাডিকশন তো থাকারই কথা নয়। এটা ক্লাসিকাল সিস্টেম-এ একটা পোলারাইজেশন দাঁড়াচ্ছে।

উৎপল : একটা বাইনারি সিস্টেম যা অ্যানটাগনিষ্টিক।

রাঘব : এই পোলারাইজেশন-এ একদিকে একটা 'creamy layer' দেখছি, অন্যদিকে একটা জিগজ্যাগ সেকশন। উৎপল বস্তু তো 'creamy layer'-এ বিলং করেন না, সুতরাং তাঁর এই কনট্রাডিকশন থাকার কথাই নয়। এটা কালচারাল টেস্ট-এর প্রশ্নে থাকতে পারে, হেরিটেজ-এর প্রশ্নে থাকতে পারে।

অজিত : এইখানে একটা কথা বলছি— 'self' 'other'-কে প্রোডিউস করছে। তার ক্রাইসিস হল, সে আর 'other' রাখছে না। কনসেপচুয়ালি যে 'other'-কে প্রোডিউস করা হল সে ওই 'self' এর ভাষাতেই কথা বলে। ধর, তুমি থার্ড ওয়ার্ল্ড তৈরি করলে, তারপর এডোয়ার্ড সাইড বা আমাকে নিয়ে গেলে— আমি থার্ড ওয়ার্ল্ডের কথা বললাম। কিন্তু কীভাবে বললাম ?

যাতে সাহেবদের ভালো লাগে। ফলে সাহেবের এজেন্ট হয়েই আমি কথা বললাম। আসলে, সাহেবকে যদি 'other' এর কথাটা শুনতেই হয় তাহলে মার্জিন-এর যে একটা মার্জিন রয়েছে, যে রিপ্রেজেন্টেড হয়, সে তার কথা-গুলো ছুড়ে দেবে আর সেন্সিটিভ সাহেব তার থেকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নেবে। যে 'self' এর কথা বলছি তাও হোমোজিনিয়াস নয়, তার মধ্যে নানারকম মানুষ থাকে—

উৎপল : অনেক ভালো লোকও থাকে। ফরাসি চিত্রনির্মাতা জঁ রুস যেমন আফ্রিকায় গিয়ে একটা মাইগ্র্যান্ট কমিউনিটি-র উপর ছবি তুলেছেন। সেখানে যতদূর সম্ভব ইনটিগ্রেট করার চেষ্টা করেছেন, তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন। এমনকি তাঁর ফিল্ম দেখেছি দুই আদিবাসী আফ্রিকান প্যারিস শহরকে নৃতত্ত্ববিদের ভাষাতে দেখছে। 'self' এবং 'other'-এর চমৎকার প্রতিফলন!

অজিত : সাহেবদের মধ্যেও যারা মার্জিনাল আর এখানে যারা মার্জিনাল, তাদের মধ্যে কী করে যোগসূত্র তৈরি হবে এটাই আজকে দেখার। আজ সাহিত্যে গ্লোবলাইজেশন-এর যুগ, কোনো একটা ভাষা খুঁজে বের করতে হবে যা পারিটিকুলার।

রাঘব : তাহলে, পাওয়ার-কে যদি সেন্টার ধরি আমার ফোকাস হল পেরিফেরি-র উপরে।

অজিত : পাওয়ার সেন্ট্রালাইজড, তার কমিউনিকেশন সিস্টেমও অর্গানাইজড, আমি কী করে করব?

রাঘব : তাহলে, পেরিফেরি নিয়ে যখন কাজ করব, আমাকে, যা কনস্ট্রাকটেড ল্যাংগুয়েজ, আরটিকুলেটেড ল্যাংগুয়েজ, তার বাইরে যেতেই হবে।

উৎপল : এখানে ল্যাংগুয়েজ-এর প্রসঙ্গ ছাড়াও অন্য কতগুলো উপাদান আছে যা ইউনিভার্সাল, যেমন পথের পাঁচালির দৃশ্য : ছেলে চলে যাচ্ছে, মা একা ঘরে শুয়ে ট্রেনের শব্দ শুনলে বুঝছে যে ছেলে চলে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখার পর সল বেলো হলের বাইরে এসে ফুটপাথে বসে কেঁদেছিলেন। কেন না, তাঁর মনে হয়েছিল গোটা দু-হাজার বছরের jewish detachment, তাদের বণ্ডিত হবার ব্যথা, ছিন্নমূল অস্তিত্ব, সব জেগে উঠেছে ওই একটি দৃশ্যে। দিস ইজ রিগ্যালি এ ইউনিভার্সাল সিচুয়েশন। বহু ফিল্ম-মেকার এ ধরনের ঘটনা ব্যবহার করেন। ইউনিভার্সালিটি অব সারটেন ইনসিডেন্টস। কথা হচ্ছে লেখার সোর্স কিন্তু এগুলো নয়, তা অন্য জায়গায়। লেখার সোর্স লেখকের সাইকিক ওয়ার্ল্ড, ইনার কনস্ট্রাকশন, নিজের ভিতরের ভুল বোঝাবুঝি, তার সেক্সুয়াল ড্রাইভ, সাইকো-লিংগুইস্টিক জ্ঞান— এসবের ভিতরে, বিরোধে-সমন্বয়ে। ফিল্ম-মেকারদের সমস্যার কথা তাঁরই বলতে

পারবেন। সত্যিই, একটা দেশের কালচার-এর রুটেড কোনো প্রোডাক্ট অনুবাদ করে অন্যত্র পেঁছে দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ আছে। কতগুলো ইউনিভার্সাল ইমোশনস্-কে আমরা ব্যবহার করতে পারি শুধু। বুদ্ধিমান, যারা জনপ্রিয় হতে চান (খারাপ অর্থে নয়) তাঁরা এ ধরনের ইমোশনস্ নিয়ে কাজ করেন।

অজিত : আমি এ ধরনের ইউনিভার্সাল অনুভূতির কথা বলছি না। ধরা যাক, জীবনানন্দের কবিতা, ওতে এমন অনেক চিত্রকল্প আছে যা কোনোভাবেই অনুবাদ করা যায় না কিন্তু ‘বসন্তে এনোঁছ আমি হাবা যুবকের হাসি’ এটা কোনো স্পেসিফিক ইমেজ নয়, এটা একজন সাহেবও তার জায়গায় প্লেস করতে পারে। আবার, ‘বনের মধ্যে দমকল উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে’— এটা জীবনানন্দে পাব না। ধরুন, লাতিন-আমেরিকার ম্যাজিক রিয়্যালিজমের কথা যা টাইম-স্পেস ভাঙে। যার মাধ্যমে রিয়্যালিটি-কে আমি পেঁছে দিতে পারি সারা বিশ্বে, বোহেঁস যেভাবে স্পেস-কে ভাঙেন। বোহেঁস নির্দিষ্ট কোনো ‘দেশি’ ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষে এভাবে করলে অবশ্যই তা নকল করা হবে, আমি সেটা করতে বলছি না। কিন্তু টাইম-স্পেস নানা ভাবে মিশে ভারতবর্ষও তো অদ্ভুত একটা জায়গা, এখানে একজন লোক কিছু ইমেজ নিশ্চয়ই ভাবে যা তার চারপাশেই আছে, যা অনেকটা কমিউনিকेट করা যায়। আবার একটা জায়গায় সেটা করা যায় না, ভীষণ স্পেসিফিক, অনুবাদে আটকে যাবে। কবিতা ভীষণভাবে পারটিকুলার—

উৎপল : ভীষণভাবে ল্যাংগুয়েজ স্পেসিফিক।

রাঘব : আমরা আবার মনোনিবেশ করি আমাদের এই আঞ্চলিক ভাষা— বাংলা ভাষাতেই। উৎপলদা, ফর্ম আর কনটেন্ট নিয়ে সাহিত্যে যে বিতর্ক, পদ্রনো এই ব্যাপারটা নিয়েই আপনার মন্থে শুনতে চাই।

উৎপল : বেশি কিছু বলার নেই এটা নিয়ে। এটা সর্বাধিক মতো তৈরি হয়েছে। যখন কাজে লাগে তখন শব্দদুটোকে আমরা ব্যবহার করি, আবার কাজে যখন লাগে না তখন বালি ফর্ম আর কনটেন্ট একই জিনিস। এরকম বহু সমান্তরাল জিনিস আমি খুঁজে বার করতে পারি। একসময়, গার্ট্রুড স্টাইন বলেছিলেন : ‘The composition is the only explanation’— ছবির ক্ষেত্রে বিশেষ করে। এই ধরনের এক্সপ্লানেশন হয় কিনা, ফর্ম ধরে ব্যাখ্যা হয় কিনা, এই সমস্ত ব্যাপারে আমি নিজে তেমন উৎসাহী নই। এগুলো আমার কনসার্ন নয়, সংশ্লেষ নয়। আমার সংশ্লেষ হচ্ছে— একটা মনোজগত, তার সঙ্গে ভাষাজগত এবং ভাষাজগতের সঙ্গে ত্রিভুজ হিসাবে একটা যৌনতার জগত আছে। এই যে যৌন সচেতনতা, আজ প্রমাণিত, এটা জন্মমূহূর্ত থেকেই থাকে। শোনা যাচ্ছে, মায়ের পেটে থাকার সময়েও যৌনতা একটা ভূমিকা

পালন করতে থাকে। আমৃত্যু একজন ব্যক্তি এই যে একটা জিনিস বহন করে চলেছে— সেক্সুয়ালিটি— এতবড় একটা ডমিনেটিং ফ্যাক্টর, আমাদের জীবনে একটা কনট্রোলিং ফ্যাক্টর, এর সঙ্গে ভাষার একটা সম্পর্ক আছে। এখন, ভাষা বা যৌনতার কীভাবে উদ্বেক হয়, কোনটা কীভাবে প্রভাবিত করে, বাইরের লেখকদের ক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণ করতে আমি রাজি নই; কিন্তু আমার নিজের লেখায় চিরদিনই এগুলো ভয়ঙ্করভাবে ফিরে এসেছে। ‘হাবা যুবকের হাসি’ প্রসঙ্গে আমি দু-একটা কথা বলে নেব। লাইনটা কিন্তু উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে আছে, কেন না লাইনটা আসলে রংগবোর কবিতায় আছে: ‘In the spring, an idiot smiles...’। একসময়ে ডালহাউসি পাহাড়ে আমি কিছুদিন ছিলাম। বিকেলে রোজ বেড়াতে বেরুতাম। নিজের জায়গা, সুড়কি-ঢালা গোল একটা রাস্তা ধরে পাহাড় ঘুরে ফিরে আসা যেত। ওখানে দেখেছিলাম ১৭/১৮ বছরের এক ছেলেকে, সে হাবা, বড়লোকের ছেলে, বিকেলবেলায় বাড়ির চাকর তাকে বেড়াতে নিয়ে আসত। এ ধরনের লোক দেখলে আমি একটু সচেতন হয়ে যাই, ওই ‘other’ দেখার মতো, এড়িয়ে চলে যাবার একটা প্রবণতা আমার আছে, অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ আছে। ওই পথে বেড়িয়ে ওদের পিছন পিছন যেতাম, যাতে দেখা না হয়। একদিন একেবারে মূখোমুখি দেখা। দেখি, চাকরটা একটা বিড়িধরানোর চেষ্টা করছে আর ছেলেটা দেশলাই নিয়ে ওর বিড়িটা ধরিয়ে দিতে চায়। আকৃতিতে সে ছোট, বারবার লাফ দিয়ে দেশলাইটা ধরার চেষ্টা করছে। এই করতে করতে ওর হাত থেকে দেশলাইটা খসে পড়ে। কাঠিগুলো সব ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে চাকরটা ওকে দুটো চড় মেরে দুজনে মিলে রাস্তা থেকে মাথা নিচু করে কাঠিগুলো তুলছে, এমন সময়, ছেলেটা মাথা তুলে দেখে উপরে একটা বিশাল পলাশগাছ— ফুলে লাল হয়ে আছে। সে তখন হ্যা-হ্যা-হ্যা করে হাসতে থাকে, মুখ দিয়ে লالا গড়ায়। এই গোটা দৃশ্যটা আমি দেখেছিলাম। আমার পরবর্তী কাজ ছিল লাইনটা খাতায় লিখে রাখা। যার লাইনই হোক আমি লিখতে বাধ্য— এই ভেবে লিখে রেখেছি, কবিতাতে ঢুকিয়ে দিয়েছি। পরে অনেক অ্যাসোসিয়েশন এসেছে। ওই ‘other’-কে যদি ধরতে হয়, identification of the ‘other’— এই যে টোটালিটি, আমি এবং হাবা যুবক, এর মধ্যে বেসিক্যালি কিন্তু কোনো তফাত নেই। তার পরের লাইনেই আসছে— অনেক বেড়ালাম, অনেক অভিজ্ঞতা হল, যতদিন কালদুবাবু জীবিত আছেন রক্তকরবী বন্ধে নেব— এর মধ্যে আমার ওই যে ইডিওসি (idiocy), আই ওয়ান্ট টু প্রিজার্ব ইট। আমার ইডিওসি-র বাইরে, এই ‘otherness’ এর বাইরে আমি যেতে চাই না, বা আমার ‘self’ এবং ‘otherness’ নিয়ে যে টোটালিটি তাকে ধরার চেষ্টা ছিল, ব্যবধান-

রেখাকে মনে দেবার চেষ্টা ছিল। এটা টিপিকাল, একটা ক্রিয়েটিভ লোকের ক্রাইসিস। You know— this is ‘self’, you know this is ‘other’ then what are you going to do with that knowledge? নলেজ তো পেলে, ঠিক আছে, তুমি বিরাট অভিজ্ঞ লোক, তারপর? Where is your action? What are you going to do? এই হচ্ছে ক্রিয়েটিভ লোকের ক্রাইসিস। তুমি অবোধ ছিলে, বোকা ছিলে, ঠিক আছে, পড়াশোনা করে হোক, ইনটুইটিভাল হোক at one stage you know, you have access to your knowledge, but then what? ক্রিয়েটিভ লোক তখন ভাবে I will do something with this, ছবি আঁকব বা লিখব ইত্যাদি ইত্যাদি।

অজিত : আপনার লেখা ‘প্রাণের দিকে চেয়ে দেখি’ ‘ঐখানে অদিত্যের কণ্ঠস্বর শুনিনি আমি’, হে যুবক নষ্ট কোরো না বীজ’ এগুলো আমার অসম্ভব প্রিয় কবিতার লাইন। বেশ কিছু কবিতায় পুরো অ্যাসোসিয়েশনটা পাই— সম্ভব কালে বাস্তব, গোয়ালঘরের মেয়েরা— যায় দিন, গ্রীষ্মের দিন যায়, যায় সূর্য, যায় দুর্ঘটনা, সময় বীজ নষ্ট কোরো না বলছে, ওদিকে অদিত্য, আদিমাতা এবং তার আগে বনের মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীন দমকলের ধূয়ে বেড়ানো— এই সম্পূর্ণটা নিয়ে একটা রিভিশন-এর কবিতা হয়ে আসে। কবিতার মধ্যে রাইটিং-এর লেভেল-এ একটা রিভিশন হল। আপনি জানছেন, সেই ভাবটা আসছে এবং রাইটিংটা তখন— ফর্মটা আস্তে আস্তে— রাইটিং-টাই কনটেন্ট হয়ে উঠছে।

উৎপল : আই টোট্যালি এগ্রি উইথ ইউ। এটাকে বলা চলে ইট’স এ ক্রিনিকল্। এটা একজনের ডায়েরি বা ক্রিনিকলের মতো সে লিখে যাচ্ছে, এগুলো হয়ত বেসিক্যালি কোনো সাহিত্য নয়।

অজিত : এটাই একটা অনুভূতি যা আজকের ছেলেমেয়েরা ভীষণভাবে শেয়ার করছে।

উৎপল : হ্যাঁ, তাদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে সেটা বদ্ব্যপ্তে পারি যে ক্রিনিকল্-টাকে তারা শেয়ার করে। আমার, সত্যি, এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলার নেই, কিছু করার নেই।

অজিত : তার দরকারও নেই। আমি একটা মেয়ে, কি একটা ফুল নিয়ে কিছু অনুভূতির কথা বললাম সেটা নয়, লেখার একটা জগতে গিয়ে লিখতে লিখতে যে একটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, কতগুলো অনুভূতি আসছে, তারপরেই ধস নামছে—

রাঘব : একটা সূত্র পাচ্ছি। আমার লেখা গড়ে ওঠাটা একটা প্রসেস যা ভাষার জগতে আছে, ছাপার জগতে আছে, আবার চারপাশের জগতেও আছে। গোটা জিনিসটা গড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া সেটাই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। অন্যভাবে উৎপলদা এটা

বলেছেন যে উনি কথা যা শোনে, টেপ রেকর্ডারের মতো রেকর্ড করে রাখেন। ফলে উৎস বলতে লিখিত বা মৃদিত সাহিত্য নয়। উৎস বিভিন্ন জায়গাতেই আছে। উৎস আর লেখা। এবার উৎস বলবসবকে সরিয়ে দিই। লেখা অ্যানোনিমাস। কতগুলো জিনিস ঘটে যাচ্ছে—

উৎস : উৎস আর রিভিশন-এর মাঝামাঝি—

রাঘব : অন-লুকার, পিকাসোর ছবির মতো— গুয়ের্নিকা হয়েই আছে—

উৎস : গোটা মধ্যযুগ তাই, কোনো লেখকের নাম নেই।

রাঘব : তাহলে উৎসকুমার একটা নাম মাত্র যে এই প্রক্রিয়ার একজন অংশগ্রহণকারী। যে একজন ক্রিনিকল রাইটার, পুরনো দিনের গিজার ক্রিনিকল রাইটার-এর মতোই প্রায়। যতই সে নিজেকে নিশ্চিত করে দেবে, নিজস্ব কালচারাল লেয়ারগুলোকে ঝরিয়ে ফেলবে ততই আরও ভালো ক্রিনিকল রাইটার হয়ে উঠবে, ক্রিনিকাল অপারেশন-এর মতো স্ক্রিমটকু তুলে সাজিয়ে দিতে পারবে। এটা ভয়ঙ্কর রকমের আধুনিকতার লক্ষণ। গুহাচিত্র যেমন কে এঁকেছে জানার মানে হয় না। যে দেখে সেই প্রণী, আবিস্কার।

অজিত : আর একটা কোয়ালিফাই করে একে উত্তর আধুনিকতা বালি। আধুনিকতা তো নামটা রাখছে, সেখানে উত্তর আধুনিকতার এলিমেন্টগুলো থাকছে।

উৎস : এখানে আর একটা কথা বালি। যারা এইরকম কাজ করবে তাদের পাঠকের উপরে গভীর বিশ্বাস রাখতে হয়, বিশ্বাস এই যে লোকে একদিন সমস্ত বদ্ব্যপ্তে পারবে, আমার সবকিছু বলে দেবার দরকার নেই। যারা ন্যারেটিভ গল্প লেখে তারা ভাবে ‘রাম বসল, রাম ভাত খেল, রাম ভাত খেয়ে জল খেল’ এভাবে না লিখলে লোকে বদ্ব্যপ্তে পারবে না। পাঠকের উপরে বিশ্বাস হারানোর চেয়ে বড় ক্রাইম ক্রিয়েটিভ লোকের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। একটা তো ‘self’ কে এক্সপ্রেস করতে না পারার ক্রাইসিস থাকেই, তার সঙ্গে এই এক্সট্রানাল ওয়াল্ড ক্রাইসিস হচ্ছে ভয়ঙ্কর।

অজিত : যারা সকলের জন্য লেখে তারা এক হিসেবে এলিট। পাঠকের ওপরে তাদের বিশ্বাস নেই।

উৎস : শূন্য তাই নয়, এ ধরনের লেখা পড়তে গেলে অপমানিত বোধ করবেন যে লেখক কেন আমাকে এইভাবে কথাগুলো বলছেন, আমি কি বদ্ব্যপ্তে পারছি না?

রাঘব : অজিতের আগের একটা প্রশ্নের অন্যরকমভাবে একটা উত্তর পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। প্রণী ঈশ্বর কিনা—লেখক ঈশ্বর কিনা। এখনও পর্যন্ত লেখকেরা মনে করে তারা ঈশ্বর এবং যারা শিল্পের শূন্যতা ইত্যাদি নিয়ে ভাবছে— তারা ঈশ্বর। আমি বলছি : না। এটা লজিকালি বালি বা না বালি, লেখার ক্ষেত্রে যখন এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করি তখন লেখক হিসাবে প্রথমেই

নিজের একজিসটেটসকে ডিনাই করি—মাই একজিসটেটস অ্যাজ এ রাইটার, মাই একজিসটেটস অ্যাজ এ গড ; তখন আমি মানুষের যুক্তি—বুদ্ধি—তার ইমাজিনেশন-এর উপর আস্থা রাখি, তার ফিলিং এমনকি ইমাজিনড ফিলিং-এর উপরেও ভরসা রাখি। অর্থাৎ স্রষ্টা তখন এক নয়, বহু। কাজেই সবচেয়ে বড় শত্রু আমিই নিজে, অর্থাৎ স্রষ্টা এখানে হয়ে যাচ্ছে একজন শ্রমিক, একজন সাংবাদিক—শিল্পসাহিত্যের সাংবাদিক—যে নিষ্ঠার সঙ্গে, গভীর মনোবৃত্তির সঙ্গে কাজ করে চলেছে—এটা না মেনে যে ক্লাউড-টা কী—কিন্তু সে জানে যে মানুষ আছে।

উৎপল : এ প্রসঙ্গে বলি—সে লিপিকার ঠিকই, এ-ধরনের মনোবৃত্তি খুব ভালো। কিন্তু ওই যে বাল্যে পোস্ট কার্ড লেখার স্মৃতিচারণ করছি—আমি সেখানে লিপিকার ঠিকই—তবু সেখানে আমার সেনসর ছিল, এডিটিং ছিল, কিন্তু যে ভাষা আমি জানি, ছোট থেকে তার ব্যবহারবিধি আমি জেনেছি—যেমন চিঠির শেষে ‘তুমি আমার প্রণাম লইও’ সে সব উনি না বললেও আমি জুড়ে দিয়েছি। এই যে আমি অ্যাড করছি—এখানেই তো I am not exactly a chronicler in the exact sense. I am adding something, I am subtracting something, I am elaborating on something, I am condensing something—বহু খেলা আমি ওখানে খেলছি।

রাঘব : ...একটা কোড আমি বার করছি। ক্রনিকল রাইটার হিসাবে যে জিনিসগুলো পাচ্ছি সেগুলো প্রেজেন্ট করছি না, তথ্য হিসাবে রাখছি না, কিন্তু প্যাকেজিং-টা এমন করছি যে একটা কোড থাকছে যা পাঠককে ডিকোড করতে হয়।

অজিত : এইখানে আমি বলব যে আমরা কিন্তু ঠগবাজ। হেঁসেলে মদ লুকিয়ে রাখি না, কিন্তু ঠগবাজ। সাহিত্য করতে গিয়ে যা আমার একেবারে ব্যক্তিগত কথা—(চুপকিয়ে দিচ্ছি)।

উৎপল : ইমোশনাল, ইনটুইটিভাল—দিস মাস্ট বি রাইট, যেমন আমি জামাইকে চিঠি লিখছি—আমার শাশুড়ি মাতা ঠাকুরাণী জীবিত নেই—অন্যের হয়ে চিঠি লিখতে গিয়ে সেই দুঃখের একটা বহিঃপ্রকাশ আমার মধ্যে ঘটতেই পারে। একে আমি অসাধুতা বলছি না। কলম ধরে যে মনোবৃত্তি লিখতে বসেছি তখনই ইমোটিভ, ইনটুইটিভ শক্তিগুলো কাজ করে।

অজিত : আসলে ওইগুলো যখন করতে যাচ্ছি তখন ঈশ্বরের একটা ভার আমার উপরে পেয়ে বসে—তখন যদি আমার একটা-দুটো কথা বলে দিতে পারি—

রাঘব : একে আমি ঈশ্বর বলছি না, আমি বলব—হিউম্যান লিমিটেশন—

উৎপল : এর রহস্যটা, প্রসেসিং-টা কী তা আমাদের অজানা। উই আর গ্রোপিং ইন দি

ডাক'। একসময় ফ্রয়েড-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল : আচ্ছা, একজন লোক যখন একটা পেন্সিল হাতে নেয়, সাদা কাগজে হঠাৎ সে ছবি আঁকতে শুরুর করে— কী হয় তার মনের মধ্যে? ফ্রয়েড মালিন হেসে জানিয়েছিলেন : Psychology is too immatured to deal with the subject। কেন আমরা সেন্সর করি, কেন এডিট করি, এটা-ওটা আনি— এর মধ্যে কত রকমের জ্ঞান কাজ করছে, কত রকমের সাইকিক প্রসেস কাজ করছে, এর রহস্য আমরা কিছুই জানি না। নানা রকমের অধীত জ্ঞান, রেসার্কশনস্, স্টিগমা কাজ করছে। আমি চাই না— এমন জিনিসও আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসছে— কত কমপ্লেক্স ফ্যাক্টর কাজ করছে— যা ব্যাখ্যার বাইরে।

অজিত : মজা হল ওই লাইনগুলোও কিন্তু পাঠকের কাছে কোডেড হয়ে আসছে। আর একটা কনটেক্সট আগে-পিছের মাঝখানে তো অন্য মানে পায়— কিন্তু আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে একটা আমার নিজের—

রাঘব : এটা সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে ঘটনাচক্রে হঠাৎ আলো নিভে গেলে পরে তার ব্যাখ্যা খোঁজার মতো।

উৎপল : এক নম্বর, হ্যাঁ তাই। এছাড়া, কমিউনিকেশন-এ খুব সিম্পল ভাবে বলা হয়— বোকার মতো— যে লেখক যেন কোড করছেন আর পাঠক যেন ডিকোড করছেন। কিন্তু রিডার রেসপনস থিয়োরি-তে এটা পরিষ্কারভাবে বলে যে পাঠকও তার নিজের মতো করে কোডিফাই করে জিনিসটা বোঝে, যে কারণে সে-ও ক্রিয়েটর। রিডার-কে যে এই সম্মান দেওয়া, এটা আধুনিক লেখকরাই শুরুর করেছেন। আমার রিডার, আমার ভিউয়ার, এরা অত্যন্ত সম্মানিত। এরা— অ্যাজ ক্রিয়েটিভ অ্যাজ আই অ্যাম। আমি কোডিফাই করছি বটে— কিন্তু এও (পাঠকও) নিজের মতো করে কোডিফাই করছে— আমার চেয়ে সে দশগুণ বেশি চালাক।

রাঘব : এখানে একটা লাইন অন-রেকর্ড রাখতে চাই যে— যারা সাহিত্যের মার্কেটিং-এ যাবে— তাদের চেয়ে যারা উৎপল বসুর মতো মার্জিনাল রাইটার, তারা পাঠককে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করে। তাছাড়া, এখন যে লেখা-লেখির চল, তার মধ্যে অটোমেটিক রাইটিং বলে একটা ব্যাপারকে চিহ্নিত করা হয়। রল্যাঁ বাথের কথা। অর্থাৎ লেখার প্রক্রিয়াটাকে লেখার মধ্যেই নিয়ে নেওয়া হয়। যেমন লেখক লেখার সময়ে যদি কফি খান, তখন হয়ত লিখলেন 'কফিতে চুমুক দিয়ে মনে হল', এটা হয়ত অপ্রয়োজনীয় একটা লাইন, কিন্তু সেটা বলে যে লেখাটি এভাবে লেখা হচ্ছে, সাইন থাকে, লেখাটিকে টাইম-স্পেস-এ বেঁধে দিই আমরা। অর্থাৎ লেখা নিয়ে আমরা এক্সজারেট করতে চাইনা। স্বর্গীয় সুষমায় তাকে মণ্ডিত করার কোনো চেষ্টাই আমাদের থাকে না।

উৎপল : আমাকে যখন ‘আজকাল’ থেকে জীবনানন্দ দাশের ‘ভারবি’ কাব্যসমগ্র রিভিউ করতে দেয় তখন আমি লিখেছিলাম যে প্লেন-এ দিল্লি যাচ্ছি, দিল্লি যাওয়ার বর্ণনা আবার খানিক কবিতা পড়া। আমার পাঠক যে কোনো সময়ে প্রশ্ন করতেই পারে যে হে সমালোচক, এরকম স্থিতিধী লেখা কোথায় বসে লিখলে? লাইব্রেরিতে-মিনিবাসে-ঘরে? আমি পাঠককে সব কিছুই ফিড করতে চাই। অন্তর্ভুক্ত লাইন ছিল তারপর। প্লেন যখন দিল্লিতে ল্যান্ড করছে— সে সময়কার বর্ণনা ছিল— সিট-বেল্ট বেঁধে নেবার ঘোষণা— নামার জন্য হুড়োহুড়ি— ইত্যাদি— আমি তখন আবার বইটা খুলে ধরি— অন্তর্ভুক্ত চারটে লাইন চোখে পড়ল আমার। আমি সেটা কোট করেছিলাম। দিস উইল অলমোস্ট মেকানিক্যালি ওয়াক ইন এভারবিড’স লাইফ— তাতে ছিল— অনেক দেশ ঘুরে যখন বাংলার মাঠে আসবে— তখন একজন চাষী তোমাকে আঙুল তুলে দেখাবে— অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাবে...ওই দিকে হচ্ছে তোমার ঘর...আমি ঝপ করে বইটা বন্ধ করে দিয়ে তাড়াতাড়ি জনস্রোতের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলাম— দেখলাম এ সাংঘাতিক জিনিস—এ-কোইনসিডেন্স বড় মারাত্মক—এ নিয়ে বেশি খেলা না করাই ভালো। এটা আমি ওই রিভিউ-তে বলেছিলাম। এখনকার দাবি হল রিভিউয়ার-কে বলতে হবে সে কোথায় বসে লিখেছে— তোমার আত্মপরিচয় দাও, শাস্ত্রাধিকার আছে কিনা বল, তবেই তোমার লেখা পড়ব। এই গ্রেট রেসপেক্ট টু দি রিডার, যা আমাদের সাহিত্যে কোনোদিন ছিল না— এটা এসেছে— এই এক্সচেঞ্জস্। এটা একদিকে যেমন নঞর্থক কিন্তু এর পার্জিটিভ দিকও আছে। এর থেকে অনেক ক্রিয়েটিভ লেখা হচ্ছে।...□

এভাবে গপ্পো আর গুলতানিতে সন্ধ্যা হয়, কলকাতার দক্ষিণে, বা আরও উত্তরে ছুটতে হবে আড্ডাধারীদের। কিন্তু তারা বেশ প্রীত, অনেক কথা হল। ভাবখানা এরকম, ‘কথা বলার কী আনন্দ! সত্যি!’